জিহাদ

ইসলামের পবিত্র যুদ্ধ
ও
তার কোরআনী বৈধতা

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহারী

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জিহাদ

ইসলামের পবিত্র যুদ্ধ
ও
তার কোরআনী বৈধতা

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহারী

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা – বাংলাদেশ

www.pathagar.com

জিহাদ

প্রকাশনায় ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
বাড়ী নং ৩৯, সড়ক নং ২,
ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা—৫

প্রকাশকাল ঃ জুন, ১৯৮৫

ইনার ও প্রচ্ছদ মুদ্রণে ঃ
তিতাস প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩, যদুনাথ বসাক লেন,
(টিপুসুলতান রোড) রংমহল, ঢাকা—১

ফোন ঃ ২৫১৬৯৪
২৩৯৪১৫

JIHAD:
Written by: Shahid Professor Ayatullah Murteza Mutahhari.
Published by: Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran.
House No.39, Road No. 2, Dhanmondi Residential Area, Dhaka-5.
Date of Publication: June, 1985

www.pathagar.com

প্রথম বক্তৃতা ঃ জিহাদ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

"যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না আর আল্লাহ্ ও তার রসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না (তাদের সাথে লড়াই করতে থাক) যতক্ষণ না তাদের নিজেদের হাতে জিজিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়।" (৯ঃ ২৯)

কোরআনের এ আয়াতটি আহলে কিতাব সম্পর্কিত। আহলে কিতাব হচ্ছে তারা যারা কোন না কোন ঐশী গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেমন ইহুদী, খৃষ্টান ও সম্ভবতঃ যরদস্তীয়।

এ আয়াতটি আহলে কিতাবদের সঙ্গে যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি আয়াত। কিন্তু একই সময়ে এটা আমাদেরকে কিতাবীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলছে না বরং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলছে যাদের আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস নেই এবং যারা আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা মেনে চলে না বরং তারা আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় লংঘন করে থাকে এবং যারা সত্যধর্ম অনুসারে ধার্মিক নয়। সেই সমস্ত আহলে কিতাবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জিজিয়া না দেবে অর্থাৎ যখন তারা জিজিয়া দিতে ও আমাদের অধীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত হবে তখন আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা চলবে না।

এ আয়াতের বিষয়বস্তু থেকে অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যা কোরআনের জিহাদ সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে উত্তর দিতে চেষ্টা করা হবে। অবশ্য আমরা এক একটি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবো।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র ওপর যাদের বিশ্বাস নেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো' বলতে ঠিক কি বুঝায়? এর মাধ্যমে কি এটাই বোঝা যায় যে, আমরা সবকিছু পরিহার করে যুদ্ধ শুরু করে দেব অথবা যে মুহূর্তে তারা তাদের অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সীমান্ত লংঘন করবে তখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো? ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে এটি একটি শর্তহীন

www.pathagar.com

আয়াত। যদি একই ধরনের শর্তসাপেক্ষ আয়াত পাওয়া যায় তবে তাকেও শর্তসাপেক্ষ আয়াত হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

শর্তহীন ও শর্তসাপেক্ষ আয়াত

এই পরিভাষাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনাদের সামনে এর আমি ব্যাখ্যা করতে চাই অন্যথা আমাদের আলোচ্য আয়াতের পুরোপুরি অর্থ অনুধাবন কঠিন হয়ে পড়বে। যে কোন নির্দেশ (এমন কি মানবীয় নির্দেশ) কখনও শর্ত ছাড়াই দেয়া যেতে পারে আবার কখনও শর্তযুক্ত করে দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে অনুধাবন করতে পারি যে যিনি সে নির্দেশ দিয়েছেন, বিধান জারি করেছেন তিনি উভয় ক্ষেত্রে একই বিষয় বুঝিয়েছেন। এটা বুঝার পর আমাদের কি করা উচিত ? আমরা কি শর্তহীন নির্দেশটি মেনে নেব এবং শর্তসাপেক্ষ নির্দেশটিকে বিশেষ ক্ষেত্রের জন্যে বিবেচনা করবো ? অথবা শর্তহীন বিষয়টিকে শর্তসাপেক্ষ হিসাবে বিবেচনা করে গ্রহণ করবো ?

আমি এখানে একটু সরল উদাহরণ দিতে চাই। উদাহরণস্বরূপ দুইটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে কারো পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেয়া হ'লো— যিনি নির্দেশ প্রদানের অধিকার রাখেন এবং যাকে আমরা সম্মান করি। এক সময় আমাদের বলা হ'লো অমুক অমুক ব্যক্তিকে সম্মান করতে হবে যা একটি শর্তহীন নির্দেশ। অন্য সময় তিনি আমাদেরকে একই নির্দেশ দিলেন কিন্তু একটু পরিবর্তন করে বললেন যে, ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই এ সম্মান করতে হবে যদি তিনি এই এই কাজগুলো সম্পাদন করেন। যেমন— আমাদের বৈঠকগুলোতে অংশ নেয়া। দ্বিতীয় বারের নির্দেশে একটি 'যদি' রয়েছে। নির্দেশটি এখন শর্তসাপেক্ষ নির্দেশে পরিণত হ'লো। নির্দেশদানকারী ব্যক্তি সাধারণভাবে এটা বলেননি যে, এই এই ব্যক্তিকে সম্মান করতে হবে বরং তিনি বলেছেন 'যদি' তারা বৈঠকে অংশ নেন তাহলেই তাদের সম্মান করতে হবে। প্রথম নির্দেশে কোন শর্ত ছিল না। আমাদেরকে বলা হ'লো তাকে সম্মান করতে এবং আমরা তা শুনলাম এর অর্থ দাঁড়ালো যে সে ব্যক্তিকে সম্মান করতে হবে তিনি বৈঠকে আসুক বা না আসুক। কিন্তু আমরা যদি দ্বিতীয় নির্দেশটি শুনি তাহলে আমরা বুঝবো যে তাকে তখনই সম্মান করতে হবে যে যদি তিনি মিটিংয়ে আসেন। কিন্তু যদি তিনি মিটিংয়ে আসা থেকে বিরত থাকেন তবে আমরা তাকে সম্মান করবো না।

www.pathagar.com

উলামাগণ বলছেন যে নিয়ম অনুযায়ী শর্তহীন বিষয়কে শর্তসাপেক্ষ হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে অর্থাৎ শর্তহীন বিষয়ের উদ্দেশ্য তাই যা শর্তসাপেক্ষ বিষয়ের উদ্দেশ্য।

এখন জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের একটিতে আমরা দেখেছি "যুদ্ধ করো সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছে তাকে হারাম করে না।" অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে "আল্লাহ্'র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" (২ঃ ১৯০)—এই আয়াতগুলোর অর্থ কি? এর অর্থ কি এই যে, এই লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক আর না করুক আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। এই নির্দেশটি কি শর্তহীন যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক আর না করুক বা তারা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করুক আর না করুক আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবো?

এ ব্যাপারে সম্ভাব্য দু'টি মত হতে পারে—একটি হচ্ছে যে নির্দেশটি শর্তহীনঃ "আহলে কিতাবগণ মুসলিম নয় তাই আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যারাই মুসলিম নয় তাদেরকে দমন না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদি তারা মুসলিমও না হয় এবং আহলে কিতাবও না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যতক্ষণ না তারা ঈমান আনবে অথবা নিহত হবে। যদি তারা আহলে কিতাব হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা মুসলিম হবে অথবা জিজিয়া দিতে প্রস্তুত হবে।" এ ধরনের মতামত তাদের যারা মনে করেন যে এ আয়াতটি একটি শর্তহীন আয়াত।

অন্য মতটি হচ্ছে যে শর্তহীন আয়াতগুলো অবশ্যই শর্তযুক্ত আয়াত হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। জিহাদে বৈধতা সংক্রান্ত কোরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে সে আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে হবে এবং তাদের মতে আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ আদৌ শর্তহীন নয়। তাহলে জিহাদের বৈধতার শর্তাবলী কি? তাদের মতে উদাহরণস্বরূপ সেগুলো নিম্নরূপঃ

অন্য পক্ষ আমাদেরকে আক্রমণ করতে ইচ্ছুক অথবা ইহা ইসলামের বাণী প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ তারা এ আহবানের

www.pathagar.com

স্বাধীনতা অস্বীকার করছে ও তা প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করছে—এ সমস্ত ক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে যে এ জাতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। অথবা জনগণ তাদের মধ্য থেকে কোন গোষ্ঠীর জুলুম ও নির্যাতনের শিকার—এক্ষেত্রে ইসলামের ঘোষণা হচ্ছে যে, আমরা অত্যাচারের হাত থেকে মজলুম জনতাকে রক্ষার জন্যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদেরকে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়টিকে কোরআনে নিম্নরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

"তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ও উৎপীড়িত-নিপীড়িতদের (মুস্তাজাফীন) পথে যুদ্ধ করছো না।" (৪ ঃ ৭৫)

আমরা কেন আল্লাহ্‌র জন্য ঐ সমস্ত পুরুষ, নারী ও শিশুর জন্য যারা অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও উৎপীড়িত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না ?

আমরা কি সমস্ত আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো ?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি সে বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে, এ আয়াতটি আমাদেরকে সমস্ত আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলছে না, বরং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না·····যারা আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ করা জিনিসকে বৈধ বানিয়ে নিয়েছে এবং যারা সত্য দ্বীনের অনুসারী নয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। এখন এ বিষয়টির অর্থ পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। এর অর্থ কি এই যে, আহলে কিতাবরা সবাই—ইহুদী, খৃষ্টান এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র প্রতি, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর প্রতি ও সত্য দ্বীনের প্রতি কোন বিশ্বাস পোষণ করে না এবং তাদের কেউ যদি আল্লাহ্ বিশ্বাসের দাবী করে তাহলে সে কি মিথ্যাবাদী বা আল্লাহ্‌র প্রতি তার মোটেই বিশ্বাস নেই ? কোরআন কি এটাই বলে যে আহলে কিতাবগণ যতই খোদা বিশ্বাসের দাবী করুক প্রকৃতপক্ষে তাদের বিশ্বাস নেই ? যেহেতু খৃষ্টানগণ ঈসা (আঃ)কে খোদা বা খোদার পুত্র বলে [illegible] করে, তাহলে কি আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই একথা বলা যাবে না ? এবং ইহুদীগণ যেহেতু ইয়াকুব (আঃ) ও অন্যান্য নবী (আঃ)গ[illegible] ওপর ঐশী সত্য ছাড়া অনেক কিছু আরোপ করে তাই ইহুদীদেরও [illegible]দের চেয়ে বেশী বিশ্বাস নেই একথা কি বলা যায় না ? অথবা যারা বলে "আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা।"

www.pathagar.com

(৫ঃ ৬৪) তারা কোনক্রমেই আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হতে পারে না এবং অন্যান্য আহলে কিতাব সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

এভাবেই যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এটাই দাঁড়ায় যে পবিত্র কোরআন মুসলিম ছাড়া অন্যদের আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে আমরা বলবো যে, পবিত্র কোরআন আহলে কিতাবদের বিশ্বাসকে বিভ্রান্তি বলে উল্লেখ করেছে। একজন খৃষ্টান তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত হলেও এমন কি আল্লাহ্‌র একত্ববাদে স্বীকৃতি প্রদান সত্ত্বেও ঈসা (আঃ) ও জিবরাঈল (আঃ) সম্পর্কে এমন সব ধারণা পোষণ করেন যা তার তৌহিদ বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে ফেলে। কতিপয় ব্যাখ্যাকারীর এ ধরনের মতামত রয়েছে। তাদের মতে যখন পবিত্র কোরআনে আমাদেরকে আহলে কিতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয় তখন আমরা সমস্ত আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো এর অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে সমস্ত আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে কারণ তাদের আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মূলতঃ গ্রহণযোগ্য নয়। এ সমস্ত ভাষ্যকারগণ মনে করেন যে, উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত নবী শব্দটি দ্বারা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে বুঝানো হয়েছে এবং 'সত্য দ্বীন' বলতে অতীতের কোন বিশেষ ধর্মকে না বুঝিয়ে সেই ধর্মকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষের গ্রহণ করা কর্তব্য—অর্থাৎ ইসলাম।

অন্য কতিপয় ভাষ্যকারগণ মনে করেন যে এই বক্তব্যের দ্বারা পবিত্র কোরআন এ কথাই তুলে ধরতে চায় যে, আহলে কিতাবগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সমস্ত আহলে কিতাবগণ এক রকম নয়, তাদের কেউ কেউ আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিহার করে চলতে হবে। আমাদেরকে ঐ সমস্ত আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যারা নামে মাত্র আহলে কিতাব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ তারা মেনে চলে না তাই আমাদেরকে সমস্ত আহলে কিতাবদের পরিবর্তে তাদের একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এটা একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা।

জিজিয়া

দ্বিতীয় প্রশ্নটি জিজিয়া বা যুদ্ধ করা সম্পর্কিত। আমাদেরকে জিজিয়া প্রদান অথবা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআন আহলে কিতাব ও মুশরিকদের (যারা আনুষ্ঠানিকভাবে মূর্তি পূজা করে এবং কোন ঐশী গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছে। পবিত্র কোরআনের কোন জায়গায়ই এটা বলা হয়নি যে, মুশরিকগণ জিজিয়া না দেয়া পর্যন্ত লড়াই করতে হবে এবং জিজিয়া প্রদান করলে লড়াই বন্ধ করতে হবে। আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখনই তারা জিজিয়া প্রদান করতে সম্মত হবে তখনই আর তাদের সঙ্গে কোন যুদ্ধ থাকবে না এটা নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট পার্থক্য।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে জিজিয়া শব্দের অর্থ কি? জিজিয়া শব্দটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ মনে করেন এটা বুৎপত্তি বিচারে আরবী শব্দ নয় এবং তার কোন আরবী ধাতু নেই বরং গাজীয়া ধাতু থেকে এ শব্দটি উদ্ভূত। 'গাজীয়া' হচ্ছে একটি করের নাম যা পারস্য রাজা আনুশেরওয়া কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। এই কর শুধুমাত্র পারস্যের জনগণের ওপর মাথা পিছু ধার্য করা হ'তো এবং সেটা যুদ্ধের জন্য সংগ্রহ করা হ'তো। তারা বলেন যে, এই শব্দটির ব্যবহার ইরান থেকে বর্তমান নজফের (ইরাক) কাছাকাছি হিরা শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে গোটা আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে যায় এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

অন্যরা বলেন যে জিজিয়া ও গাজীয়া খুব কাছাকাছি শব্দ হওয়া সত্ত্বেও জিজিয়া একটি আরবী শব্দ এবং তা 'জাঝা' ধাতু থেকে উদ্ভূত। অধিকাংশ শব্দতত্ত্ব বিশারদগণ এটাই মনে করেন। আমাদের লক্ষ্য শব্দের প্রকৃতি বিশ্লেষণ নয় বরং শব্দ যে তাৎপর্য বহন করে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা। জিজিয়া কি জোর করে আদায় করা প্রতিরক্ষা মূল্য অথবা এক ধরনের ব্লাকমেল? ইসলাম কি আমাদেরকে একথা শিক্ষা দেয় যে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে হবে আর যখন টাকা আদায় হবে তখন যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। একজন কবি তো বলেই ফেলেছেন যে।

"আমরা হচ্ছি সেইসব লোক
যারা সম্রাটদের কাছ থেকে
কর আদায় করেছি, এরপর
তাদের রাজদণ্ড ও মুকুট কেড়ে নিয়েছি।'

জিজিয়ার অর্থ যদি এক ধরনের ব্লাকমেল হ'য়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তাঁর প্রকৃত অর্থ কি? এটি কোন্ ধরনের নির্দেশ? এটা কি

www.pathagar.com

জব'রদস্তি মূলক আইন ও পাশবিক শক্তি প্রয়োগ নয়? এটা কোন্ ধরনের মানবিক অধিকার ও ন্যায়ের ভিত্তিতে ইসলাম মুসলমানদেরকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ইসলাম গ্রহণ অথবা মুসলমানদেরকে ঘুষ না দেয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছে, এমন কি বাধ্যতামূলক করেছে? উভয় অবস্থার মধ্যে সমস্যা রয়েছে কেননা মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ইসলামকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া আবার মুসলমানদেরকে অর্থ না দেয়া পর্যন্ত অর্থ হচ্ছে তাদের কাছ থেকে সম্পদ কেড়ে নিয়ে আসা। উভয় ক্ষেত্রেই শক্তি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। হয় জোর করে বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে হবে না হয় জোর করে টাকা আদায় করতে হবে। তাই জিজিয়া বলতে কি বুঝায় তার বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। এটা কি সত্যিই জোর করে টাকা আদায় অথবা নিরাপত্তামূল্য না কি অন্য কিছু?

এখন আমরা এ আয়াতের অর্থ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলী মুলতবী রেখে অন্য কতিপয় বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো যা পূর্বাহ্নেই আলোচিত ও বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন।

জিহাদের কারণ ও উদ্দেশ্য

প্রথম বিষয় হচ্ছে জিহাদের আইনের পিছনের অন্তর্নিহিত কারণগুলো কি? কেউ কেউ মনে করেন যে ধর্মের মধ্যে আদৌও যুদ্ধের আদেশ থাকা উচিত নয়। ধর্মে যুদ্ধের আইন থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা যুদ্ধ হচ্ছে একটা খারাপ জিনিস তাই ধর্মকে যুদ্ধের আইন চালু করার পরিবর্তে তার বিরোধিতা করাই উচিত। অন্যদিকে আমরা জানি যে, জিহাদ হচ্ছে ইসলামের একটি মৌলিক কর্তব্য। যখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, ধর্মের মৌলিক কর্তব্যগুলো কি কি? তখন আমরা বলি যে— "নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, খোমস ইত্যাদি।"

ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের প্রচারণার একটি বড় যুক্তি হচ্ছে এ বিষয়টি। প্রথমতঃ তাদের জিজ্ঞাসা যে, ইসলামে এমন বিধান কেন রয়েছে? এবং তারা বলে যে যুদ্ধের আইনগত অনুমতির কারণে মুসলমানগণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে জোরপূর্বক তাদের ওপর ইসলাম চাপিয়ে দেয়। তারা দাবী করে যে, সমস্ত ইসলামী জিহাদ ইসলামকে চাপিয়ে

www.pathagar.com

দেয়ার জন্যই সংঘটিত হয়েছে। এ অনুমতির কারণেই মুসলমানগণ জোর করেই ইসলাম চাপিয়ে দিয়েছে এবং তাদের মতে এভাবে আজ পর্যন্ত ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। তাদের মতে ইসলামে জিহাদের নীতি এবং মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে স্থায়ী বিরোধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে ইসলামে যুদ্ধ আইনে মুশরেক ও অমুশরেকদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। কিতাবীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের সুযোগ রাখা হয়েছে যা মুশরিকদের জন্য রাখা হয়নি।

অন্য একটি বিষয় হচ্ছে যে ইসলাম কি আরব উপদ্বীপ ও বাকী বিশ্বের সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি করে? ইসলাম কি কোন একটি জায়গাকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করেছে যেখানে মুশরিক বা আহলে কিতাবগণ প্রবেশ করতে পারবে না। এই জায়গাটি কি আরব উপদ্বীপ? যার বাইরে ইসলাম মুশরিক ও আহলে কিতাবীদের সঙ্গে এতটা কঠোর নয়? মূল কথা আরব উপদ্বীপের সঙ্গে অন্য এলাকার কোন দিক থেকে কি কোনরূপ পার্থক্য রয়েছে?

এর উত্তর হচ্ছে যে মক্কা এবং অন্যান্য স্থানের মধ্যে নিঃসন্দেহে পার্থক্য রয়েছে এবং আমাদের আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে "মুশরিকগণ অপবিত্র তাই তারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না।" (৯ঃ ২৮)

চতুর্থ হচ্ছে মুশরিকদের সঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত। কোন মুসলিম কি কোন মুশরিকের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে বা তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে পারে? কেউ যদি এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে সেটি মানতে হবে কি, নাকি মেনে চলতে হবে না? সর্বশেষ বিষয়টি হচ্ছে যুদ্ধের শর্তাবলী সংক্রান্ত। ইসলাম কখন এবং কোন্ ধরনের যুদ্ধ বৈধ ঘোষণা করেছে এবং কোন্ ধরনের যুদ্ধ বৈধ এবং কোন্ ধরনের যুদ্ধ ইসলামে নিষিদ্ধ? উদাহরণস্বরূপ ইসলাম কি সব ধরনের মানুষকে হত্যা বৈধ ঘোষণা করেছে অথবা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে?

ইসলাম কি ঐ সমস্ত লোকদেরকে হত্যা করা বৈধ করেছে যারা অস্ত্র ধারণ করেনি, যারা বৃদ্ধ, নারী এবং শিশু এবং যারা শান্তিপূর্ণভাবে স্ব স্ব কাজ ও ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছে? ইসলামে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ না অবৈধ—এসব বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

জিহাদের বৈধতা

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে জিহাদের বৈধতা সম্পর্কে—ধর্মের ভেতরে জিহাদ বা যুদ্ধ আইন ও অনুমতি থাকা আদৌ সঠিক কিনা। আপত্তিকারীদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ না, যুদ্ধ হচ্ছে একটি মন্দ বিষয় এবং ধর্ম সর্বদাই মন্দের বিরুদ্ধে, অতএব ধর্ম যুদ্ধেরও বিরুদ্ধে থাকবে। ইহা সব সময়ই শান্তির স্বপক্ষে কথা বলবে। যেহেতু ধর্ম শান্তির সমর্থনে রয়েছে তাই ধর্মে যুদ্ধের কোন বিধান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এবং এটা কখনই যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে না। খৃষ্টানগণ এ ধরনের প্রচারণা চালিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে যদিও তা একটি দুর্বল ও শক্তিহীন প্রচারণা মাত্র যার কোন সত্যিকার ভিত্তি নেই। যুদ্ধ কি সর্বদাই মন্দ? যদি জুলুমের মুকাবেলায় সত্যের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহলেও কি তাকে মন্দ বলা চলে? অবশ্যই নয়। আমাদেরকে যুদ্ধের শর্ত ও উদ্দেশ্য যাচাই করতে হবে এবং কেন ও কোন্ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে তা বিবেচনা করতে হবে। কখনও যুদ্ধ সুস্পষ্টভাবে আগ্রাসন ও জুলুমে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ যখন কোন জনগোষ্ঠী বা জাতি লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে, অন্যদের ভূমি অধিকার করতে চায় অথবা জনগণের সাধারণ সম্পদের ওপর আধিপত্য স্থাপনে আকাঙ্খী হয় বা উচ্চাভিলাষী হয়ে অন্যের ওপর নিজেদের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে এগিয়ে আসে এবং বলে যে "সমস্ত জাতির মধ্যে আমরাই হচ্ছি শ্রেষ্ঠ এবং ঐ সমস্ত জাতির ওপর আমরা কর্তৃত্ব স্থাপন করবো" তখন সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধের স্বপক্ষে এ ধরনের যুক্তি মোটেই গ্রহণ-যোগ্য ও সঠিক নয়। কোন যুদ্ধ যদি অন্যের এলাকা দখল, জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন বা বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী তুলে অর্থাৎ "ঐ সমস্ত জনগোষ্ঠী নিম্নস্তরের আর আমরা উচ্চস্তরের এবং উন্নত ও উৎকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতিকে শাসন করবে"—এ তত্ত্বের ভিত্তিতে সংঘটিত হয় তা নিঃসন্দেহে জুলুম ও পীড়ন এবং সীমা লংঘন ছাড়া কিছু নয়। এ জাতীয় যুদ্ধ নিশ্চিতভাবে মন্দ এতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তীতে আরেক ধরনের যুদ্ধের কথা আলোচনা করব তা বিশ্বাস চাপানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ। কিন্তু যদি কোন যুদ্ধ জুলুম-আগ্রাসনের প্রতিরোধে সংঘটিত হয়—যারা আমাদের ভূমি দখল করেছে বা আমাদের সম্পদ ও সম্পত্তির ওপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। আবার যারা আমাদের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে ভূ-লুণ্ঠিত করে তাদের আধিপত্য

www.pathagar.com

চাপিয়ে দিতে চায় সেসব ক্ষেত্রে ধর্মের দায়িত্ব কি ? এ সব পরিস্থিতিতে ধর্ম কি বলবে; যুদ্ধ নিরংকুশভাবে মন্দ বস্তু, অস্ত্র হাতে ধরা মন্দ কাজ ; তলোয়ার উত্তোলনও মন্দ কাজ ; এবং এভাবেই ধর্ম কি শান্তির শ্লোগান তুলবে ? যখন আমরা কারো দ্বারা আক্রান্ত হবো এবং তারা যখন আমাদের ধ্বংস করার জন্যে এগিয়ে আসবে তখনও কি আমরা শান্তি রক্ষার অজুহাতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো না—যা প্রকৃতপক্ষে আত্মরক্ষারই কাজ ? এ অবস্থায় যুদ্ধ না করা শান্তি রক্ষা নয়—আত্মসমর্পণ করা।

শান্তির অর্থ আত্মসমর্পণ নয়

সবক্ষেত্রে আমরা একথা বলতে পারি না যে যেহেতু আমরা শান্তির প্রবক্তা, আমাদেরকে যুদ্ধের বিরোধিতা করতে হবে। এ ধরনের ভূমিকার অর্থ হবে দুঃখ-দুর্দশা ও আত্মসমর্পণের পক্ষে কথা বলা। মনে রাখবেন শান্তি ও আত্মসমর্পণ দুটো ভিন্ন বিষয় যেমন চক এবং পনির দুটো ভিন্ন জিনিসের নাম। শান্তির অর্থ হচ্ছে সম্মানজনক সহাবস্থান কিন্তু আত্মসমর্পণ সম্মান-জনক সহাবস্থান নয় বরং এটা হচ্ছে এমন এক সহাবস্থান যেখানে এক পক্ষ নিরঙ্কুশভাবে অসম্মানার্হ। বস্তুতপক্ষে এটা এমন সহাবস্থান যেখানে উভয় পক্ষই অসম্মানার্হ—এক পক্ষ আগ্রাসন ও জুলুম করার কারণে আর অপর পক্ষ জুলুম ও অন্যায়ের মুকাবেলায় আত্মসমর্পণের কারণে।

অতএব এ ধারণার বিভ্রান্তি অবশ্যই দূর করতে হবে। যে ব্যক্তি ঘোষণা করে যে সে যুদ্ধের বিরোধী—প্রকৃতপক্ষে বলে যে যুদ্ধ সামগ্রিকভাবে মন্দ ও অকল্যাণকর—তা অন্যায়ের জন্যে হোক বা অন্যায়ের মুকাবেলায় হোক—এ ধরনের ধারণা বড় ধরনের ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। যে যুদ্ধ সীমা লংঘনমূলক তা অবশ্যই মন্দ কিন্তু যা সীমা লংঘন ও অন্যায়ের মুকাবেলায় প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার সংগ্রাম তা অত্যন্ত ভাল কাজ এবং মানব জীবনের জন্যে অতীব জরুরী প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনও এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে। এমনকি তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে ও ব্যাখ্যা করেছে। একটি স্থানে কোরআন বলছে, "এবং যদি আল্লাহ্ মানুষের এক দল দ্বারা অন্য দলকে দমন না করতেন তাহলে পৃথিবী ফেতনা-ফাসাদে ভরে যেত।"—(২ঃ ২৫১) অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে "যদি আল্লাহ এক দলকে অন্য দল দ্বারা দমন না করতেন তাহলে খানকা, গীর্জা, উপাসনালয় ও

www.pathagar.com

মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহ্‌র নাম বিপুলভাবে স্মরণ করা হয় তা ধ্বংস করে দেয়া হতো।" (২২ ঃ ৪০) আল্লাহ্‌তায়ালা যদি এক দলকে আরেক দল দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন তাহলে ধ্বংস, ফেতনা-ফাসাদে সমস্ত পৃথিবী ভরে যেত। অধিকন্তু এ জন্যেই পৃথিবীর প্রতিটি দেশ তাদের প্রতিরক্ষার জন্য স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার অত্যাবশ্যক মনে করে। আগ্রাসনকে প্রতিরোধের জন্যে সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব নিরঙ্কুশভাবে অত্যাবশ্যক। এখন দুটো দেশের সম্পর্কে, যাদের উভয়ের সেনাবাহিনী রয়েছে—একটি আগ্রাসী তৎপরতা চালানোর জন্যে অপরটি প্রতিরক্ষার জন্যে একথা বলা চলে না যেটির আগ্রাসনের উদ্দেশ্য নেই তা যার আগ্রাসনের ইচ্ছে রয়েছে তার চেয়ে দুর্বল। যদি সে অধিকতর শক্তিশালী হতো তাহলে তারও আগ্রাসনের ইচ্ছা থাকত। আমরা এখানে এ বিষয়ে আলোচনার কোন অবতারণা করতে চাই না। বস্তুতঃ সেনাবাহিনীর সংরক্ষণ প্রতিটি জাতির প্রতিরক্ষার জন্যে অপরিহার্য এবং যে কোন আগ্রাসনের মুকাবেলা করার মতো সামরিক শক্তি তার থাকতে হবে।

পবিত্র কোরআন বলছে, "আর তোমরা যতটুকু সম্ভব শক্তিশালী ও সদা সজ্জিত ঘোড়া প্রস্তুত করে রাখ যা দিয়ে আল্লাহ্‌ ও তোমাদের শত্রুদের ভীত শংকিত করতে পারো··· ··।" (৮ ঃ ৬০) ঘোড়া প্রস্তুত করার কথা বলার কারণ হচ্ছে যে অতীতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘোড়াকে সেনাবাহিনীর শক্তিমত্তার পরিচয় মনে করা হতো কিন্তু স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোরআনের সরল অর্থ হচ্ছে আমাদের শত্রুদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করা এবং তারা যাতে আক্রমণে সাহসী না হয় এর জন্যে আমাদেরকে সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে ও শক্তিশালী হতে হবে।

ইসলাম ও খৃষ্টবাদের মধ্যে পার্থক্য

খৃষ্টবাদ সম্পর্কে বলা হয় যে কোন ধরনের যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকাই এর বৈশিষ্ট্য। অন্যটিকে আমরা বলি যে জিহাদের আইন হচ্ছে ইসলামের বৈশিষ্ট্য। যদি আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে খৃষ্টবাদে জিহাদের সুযোগ নেই কারণ এর মধ্যে আদৌ কিছু নেই। একথা দ্বারা আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে, খৃষ্টবাদে কোন সামাজিক

www.pathagar.com

কাঠামো নেই। নেই কোন আইন ব্যবস্থা, না আছে সমাজ গঠনের কোন নিয়ম-পদ্ধতি। কাজেই জিহাদের ব্যবস্থা থাকার কোন প্রয়োজনই সৃষ্টি হয় না। খৃষ্টবাদের কোন সারবত্তাই নেই। কতগুলো নৈতিক যেমন সত্য কথা বলবে, মিথ্যা কথা বলবে না, অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না ইত্যাদি নিয়েই খৃষ্টবাদ গড়ে উঠেছে। এমনি অবস্থায় সে ধর্মে জিহাদের স্থান থাকার কথা নয়। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার একটি সমাজ গঠনের দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ইসলাম এসেছে সমাজের পুনর্গঠন ও সংস্কার সাধন ও একটি জাতি গঠনের জন্যে। ইসলাম চায় গোটা পৃথিবীর সংস্কার ও সংশোধন। এ ধরনের একটি ধর্ম নির্লিপ্ততার পথ গ্রহণ করতে পারে না। ইহা জিহাদ ছাড়া চলতে পারে না। ঠিক একইভাবে এর সরকার সেনাবাহিনী বাদ দিয়ে হতে পারে না। যেখানে খৃষ্টবাদের পরিধি চরম-ভাবে সীমাবদ্ধ ঠিক তেমনি ইসলামের পরিধি চরমভাবে বিস্তৃত। খৃষ্টবাদ যেখানে উপদেশের স্তরের বাইরে পা বাড়াতে রাজী নয় সেখানে ইসলাম গোটা জীবনের কর্মকাণ্ডে পরিব্যপ্ত। এতে রয়েছে সমাজ পরিচালনা, রাজনীতি, অর্থনীতি সংক্রান্ত বিধানাবলী। ইহা এসেছে একটি রাষ্ট্র গঠন করতে, সরকার গঠন করতে, যখন তা করা হয় তখন কি করে সেনাবাহিনী ছাড়া তা হতে পারে? জিহাদ ছাড়া তা চলতে পারে?

ইসলাম ও শান্তি

যারা বলেছেন যে শান্তি ভালো এবং যুদ্ধ সার্বিকভাবে মন্দ বিধায় ধর্ম সর্বদা যুদ্ধের বিরোধিতা ও শান্তির স্বপক্ষে বলা উচিত তা মূলত ভুল করছেন। ধর্ম অবশ্য শান্তির কথা বলবে এবং কোরআন বলেছে "শান্তি উত্তম বস্তু।" কিন্তু সাথে তাকে যুদ্ধের পক্ষেও বলতে হবে। যদি বিরোধী পক্ষ শান্তি ও সম্মানজনকভাবে সহাবস্থান করতে না চায় যেখানে তারা মানবিক মর্যাদা ও সম্মানকে ভূ-লুণ্ঠিত করতে চায় সেখানে শান্তির নামে আত্মসমর্পণ মানে নিছক দুঃখ-কষ্টকে অভ্যর্থনা করা এবং অসম্মানজনক অবস্থাকে মেনে নেয়া। ইসলাম বলছে, "শান্তি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য যদি অপর পক্ষ চায় ও গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় আর যদি তারা শান্তির বদলে যুদ্ধ চায় তবে যুদ্ধই হবে।

www.pathagar.com

যুদ্ধের শর্তাবলী

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যুদ্ধ যে কোন্ সব শর্তাবলীর অধীনে ইসলাম আমাদের যুদ্ধ করতে বলেছে ? সমস্ত ভাষ্যকারের মতে কোরআনের জিহাদ সংক্রান্ত প্রথম আয়াত হচ্ছে সূরা হজ্জের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ঃ

"নিশ্চিত আল্লাহ্ সে লোকদের যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন খেয়ানতকারী অস্বীকারকারীদের পছন্দ করেন না। যারা আক্রান্ত ও নির্যাতীত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চিতই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। এরা সেই লোক যারা নিজেদের ঘরবাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। তাদের অপরাধ ছিল শুধু এতটুকু যে তারা ঘোষণা করেছিল, 'আল্লাহ্ আমাদের রব'। আল্লাহ যদি এক দল দ্বারা অপর দলকে প্রতিরোধ না করতেন তাহলে খানকাসমূহ, গীর্জা ও উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে আল্লাহ্র নাম বিপুলভাবে স্মরণ করা হয়—সবই ধ্বংস করে দেয়া হতো। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন যারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী ও অতিশয় প্রবল। এরা সে লোক যাদেরকে জমিনে ক্ষমতা দান করা হলে তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে, ন্যায়ের আদেশ করবে, অন্যায়ের নিষেধ করবে আর সব ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্র হাতে।" (২২ ঃ ৩৮৪)

এগুলো বিস্ময়কর আয়াত। এগুলো হচ্ছে জিহাদকে বৈধ করার প্রথম কোরআনী ঘোষণা।

মক্কায় মুসলমান

এগুলো বিশ্লেষণের পূর্বে আমাদেরকে আরো কতিপয় দিকের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। আমরা সবাই জানি মক্কায় চল্লিশ বছর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর ওপর প্রথম 'অহি' আসে। নবী করীম (দঃ) নবুয়তের প্রথম তেরো বছর মক্কায় অবস্থান করেন এবং এ তেরো বছরে তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ অস্বীকারকারী মক্কার ক্ষমতাসীন কোরাইশগণ কর্তৃক জঘন্যভাবে নিগৃহীত ও উৎপীড়িত হন। অত্যাচারের মাত্রা এতটা ভয়াবহ ছিলো যে একদল সাহাবী হিজরত করার জন্যে রসূলের (দঃ) অনুমতি চাইতে বাধ্য হন এবং তারা মক্কা ত্যাগ করে ইথিওপিয়ায় চলে যান।

www.pathagar.com

পুনপৌণিকভাবে মুসলমানগণ আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্যে রসূলের (দঃ) নিকট আবেদন জানাতে থাকেন। কিন্তু হযরত (দঃ) মক্কার তেরো বছরে তা অনুমোদন করেননি। এর কারণ ছিলো যে তিনি তার কর্মতৎপরতা একটি শক্তিশালী রূপ ধারণ না করা এবং মদিনাসহ অন্যান্য স্থানে ইসলামের প্রচার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। মদিনার একটি ছোট দল ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারা মক্কায় গমন করে রসূল (দঃ)-এর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এবং তিনি মদিনায় হিজরত করলে তারা তাঁকে সর্বোতভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। তাই তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ মদিনায় হিজরত করেন। প্রথমবারের মতো মদিনায় একটি স্বাধীন 'মুসলিম ভিত্তির' অস্তিত্ব লাভ ঘটে। প্রথম বছরে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো না, হিজরী দ্বিতীয় বছরে জিহাদের প্রথম আয়াত যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি তা নাজিল হয়। আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে "নিশ্চয়ই বিশ্বাসীদের রক্ষা করেন ·· আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক ও অস্বীকারকারীদের পছন্দ করেন না।" এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মুশরিকগণ মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, তাদের বিরুদ্ধে এরা সীমা লংঘনমূলক ও দুবিনীত আচরণ করেছে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপর কোরআন ঘোষণা করে, যাঁরা আক্রান্ত ও নির্যাতীত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে।' তাদেরকেই যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে যাদের সঙ্গে অন্যরা যুদ্ধ করতে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে "হে মুসলমানগণ কাফের মুশরেকগণ তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে অতএব তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। কেন তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে? কারণ নির্যাতীত যারা তারা অবশ্যই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তারপর এসেছে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি "নিশ্চিতই আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম যাদেরকে অন্যায়ভাবে কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাদের বাড়ীঘর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কারের কারণ তো ছিলো এতটুকু যে তারা ঘোষণা করেছিলো আল্লাহ্‌ই আমাদের একমাত্র রব।" যারা অন্যায়ভাবে নিজেদের বাড়ীঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল একমাত্র এ অপরাধে যে তারা আল্লাহ্‌কে নিজদের রব, প্রভু, প্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছিলো—তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেয়া হলো তাদের অপরাধ হচ্ছে তাদের এ ঘোষণা—'রাব্বুনাল্লাহ" আল্লাহ্ আমাদের রব। এ সমস্ত লোকদেরকে আল্লাহ্ যুদ্ধের অনমতি দিলেন।

www.pathagar.com

লক্ষ্য করুন আয়াতগুলোয় কত প্রতিরক্ষার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। এরপর বর্ণিত হয়েছে জিহাদের সমর্থনে যুক্তিসমূহ। পবিত্র কোরআন অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে সেগুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে। কেননা এখানে কোরআনের বিশেষ আয়াতগুলো যেন বর্তমান যুগের খৃষ্টানগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশস্ত সমস্যাগুলোর জবাব দিচ্ছে। খৃষ্টানগণ যেন বলছে "হে কোরআন। তুমি ঐশী গ্রন্থের দাবীদার; তোমাকে ধর্মীয় গ্রন্থ মনে করা হয়, তাহলে তুমি কিভাবে যুদ্ধের অনুমতি দিচ্ছ? যুদ্ধ একটি জঘন্য ব্যাপার। সর্বদাই বলো শান্তি, বলো পবিত্রতা, বলো এবাদত।"

কিন্তু কোরআন বলছে: না, যদি অন্যপক্ষ আগ্রাসন চালায় এবং আমরা যদি আত্মরক্ষার চেষ্টা না করি তাহলে একটি পাথরও আর একটি পাথরের ওপর পড়বে না—সমস্ত উপাসনালয়গুলো ধ্বংস হয়ে যাবে—"যদি আল্লাহ্ এক দলকে দিয়ে অপর দলকে প্রতিরোধ না করতেন তাহলে খানকা, গীর্জা, উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহ্র নাম বেশী বেশী স্মরণ করা হয়—তা সব ধ্বংস হয়ে যাবে।" তথাপি আল্লাহ্ একদল দ্বারা অপর দলকে দমন না করতেন তা হ'লে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মের উপাসনালয়গুলো জ্বলে ধ্বংস হয়ে যেত। খৃষ্টানদের চার্চ, ইহুদীদের উপাসনালয়, মন্দির, মুসলমানদের মসজিদ কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতো না। কতক লোকের আগ্রাসী ও জুলুমমূলক তৎপরতার কারণে কেউই আল্লাহ্র উপাসনা করার জায়গা খুঁজে পেত না।

পবিত্র কোরআন এরপর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন, "এবং আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বময় শক্তিশালী ও অতিশয় প্রবল।" যারা আল্লাহ্কে সাহায্য করবে—একথার অর্থ হচ্ছে যারা সত্য ও ন্যায়নীতির সাহায্য করবে তাদেরকে আল্লাহ্ সাহায্য করবেন—যিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজয়ী।

এখন লক্ষ্য করুন, কিভাবে আল্লাহ্ যারা সাহায্য করবে তাদের বর্ণনা দিচ্ছে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যারা সরকার গঠন করলে সেই ধরনের সরকারই গঠন করেন যার কথা কোরআনে বলা হয়েছে, "এরা তারাই যাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে.....।" তারা ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ্ পৃথিবীর কোন অঞ্চলে ক্ষমতা প্রদান করলে তারা সেই ধরনের সরকারই গঠন করবে। কোন্ ধরনের সরকার? "... নামাজ প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

.....” —অর্থাৎ তারা নামাজ ও ইবাদতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। জাকাত আদায় করবে.....অর্থাৎ তারা বিশুদ্ধকরণ কর প্রদান করবে।” নামাজ হচ্ছে আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে সঠিক আধ্যাত্মিক সংযোগ আর জাকাত হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার আধ্যাত্মিক বন্ধন। যারা আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে ও একে অন্যকে সহায়তা করে, ... “যারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে.....” যারা সৎ কাজে আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজে নিষেধ প্রদানকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে নিয়েছে। “সব কাজের শেষ পরিণতি আল্লাহ্‌ই”— অর্থাৎ সব বিষয় ও সব কাজের শেষ ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়টা আমরা বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে পবিত্র কোরআন মৌলিকভাবে জিহাদকে আগ্রাসনমূলক বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধের বদলে আগ্রাসন বিরোধী যুদ্ধ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে।

অবশ্য প্রতিরোধযোগ্য আগ্রাসনের ধরন সর্বদাই এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের শুধু ভূমি আক্রমণ হবে এমন কথা নেই। সম্ভবতঃ আগ্রাসনের একটি রূপ হচ্ছে একই দেশের মধ্যে একটি অত্যাচারী জালেম গোষ্ঠী কর্তৃক সেই দেশেরই দুর্বল নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর (যাদেরকে কোরআনের ভাষায় মুস্তাদআফিন বলা হয়) ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালানো। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিমগণ নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। উৎপীড়িত-নিপীড়িত মানবতার মুক্তির জন্যে মুসলিমগণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অথবা এক পক্ষ কর্তৃক এমন জাতির ওপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, দমন নীতি চালানো যে হকের আওয়াজ, সত্য-সুন্দর ন্যায় ও প্রেমের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে -- যা দূর করার জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এসব কিছুই সীমা লংঘন ও আগ্রাসনের বিভিন্ন রূপ। মুসলমানগণকে অবশ্যই চিন্তা ও চিন্তা বর্জিত সর্বক্ষেত্রে অধীনতার শিকল থেকে মানবতাকে মুক্ত করতে হবে। এসব পরিস্থিতিতে জিহাদ অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন --আর এ জিহাদ হচ্ছে মূলতঃ জুলুমের বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচার ও সীমা লংঘন ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার সংগ্রাম। “প্রতিরক্ষা” শব্দটি দ্বারা সাধারণভাবে প্রচলিত জুলুম ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাকে বুঝায়। কিন্তু জুলুমের ধরন ও সীমা লংঘনের বিভিন্ন প্রকরণ সম্পর্কে আরো অধিক আলোচনা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বক্তৃতা ঃ প্রতিরক্ষা অথবা আগ্রাসন

ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টবাদের আপত্তি ঃ

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, খৃষ্টজগত তাদের ধারণা মতে ইসলামের একটি দুর্বলতা হিসেবে 'জিহাদের' বিষয়টি উত্থাপন করেছে। তারা বলেন যে, ইসলাম হচ্ছে যুদ্ধ-বিগ্রহের ধর্ম—শান্তির নয়, অন্যদিকে খৃষ্টবাদ হচ্ছে শান্তির ধর্ম। খৃষ্টবাদের মতে যুদ্ধ সামগ্রিকভাবেই মন্দ বিষয় আর শান্তি হচ্ছে সর্বদাই ভালো ও কল্যাণকর। তাই প্রতিটি ঐশী ধর্মকে অবশ্যই শান্তির স্বপক্ষে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। সেদিন পর্যন্তও খৃষ্টবাদ তাদের জন্যে নির্ধারিত নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছুকে বিচার-বিশ্লেষণ করত। তাদের সেই নৈতিকতার—আদর্শটি 'অন্য গালটি ফিরিয়ে দেয়ার' স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো। তাদের নৈতিক আদর্শ ছিলো মূলতঃ দুর্বলতা ও হীনতা প্রদর্শনের নৈতিকতা। অবশ্য বর্তমানে তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে। তারা এখন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করছে— বিভিন্ন মাধ্যমে তারা চালাচ্ছে বিশ্বজোড়া প্রচারণা। প্রচারণার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা। তারা এখন বলছে যে যুদ্ধ হচ্ছে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জাতীয়তা সবকিছুই হচ্ছে যুদ্ধের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আমরা মুসলমানগণ এগুলোকে উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখে থাকি—নৈতিক দৃষ্টিকোণ ও নৈতিক মান এবং মানবিক অধিকার ও "নতুন" মানবিক মানের দৃষ্টিকোণ সবদিক থেকেই আমি পূর্বের আলোচনায় এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছি। এটা সুস্পষ্ট যে, খৃষ্টানদের এ বক্তব্য মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়।

অবশ্য 'শান্তি' ভালো ও কল্যাণকর, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই এবং আমাদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও আগ্রাসন চালানোর জন্যে যে যুদ্ধ পরিচালিত হয় জাতিসমূহের ভূমি দখল, তাদের সম্পত্তি গ্রাস ও মানুষকে দাসে পরিণত করা ও আগ্রাসীশক্তির আইন-কানুন, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যা কোনক্রমেই আগ্রাসী শক্তির প্রতিরোধের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় না তা অবশ্যই নিঃসন্দেহে একটি মন্দ ও অকল্যাণকর কাজ। মূলতঃ যা সীমা লংঘন ও আগ্রাসন তাই মন্দ। আগ্রাসন অবশ্যই মন্দ কিন্তু সব যুদ্ধ বা সব পক্ষের যুদ্ধ আগ্রাসন নয়। যুদ্ধ আগ্রাসন হতে পারে আবার আগ্রাসনের জবাবও হতে পারে। কেননা কখনও কখনও আগ্রাসনের জবাব শক্তির মাধ্যমে দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়তে পারে। এমন অবস্থাও সৃষ্টি হয় যে শক্তিই শুধু জবাব হতে পারে।

যে কোন ধর্ম যদি তা সমাজের জন্যে হয়ে থাকে তবে অবশ্যই আগ্রাসন বা আক্রমণের মুকাবেলায় কি করতে হবে এ ব্যাপারে তাকে দিকনির্দেশিকা দিতে হবে। শুধু নিজেরা আক্রমণের সম্মুখীন হলেই নয় বরং অন্য লোকেরাও আক্রমণের সম্মুখীন হলে কি করণীয় ধর্মকে এ ব্যাপারেও পথনির্দেশ দিতে হবে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে ধর্মের অবশ্যই যুদ্ধের বিধান বা জিহাদের সুযোগ থাকতে হবে। খৃষ্টবাদ বলে যে 'শান্তি ভালো ও কল্যাণকর।' আমরাও তা স্বীকার করি যে শান্তি নিঃসন্দেহে ভালো জিনিস। কিন্তু আত্মসমর্পণ, অবমাননা ও দুঃখকষ্ট সম্পর্কে কি বলা হবে? যদি একটি শক্তি আরেকটি শক্তির মুকাবেলায় উভয়ই শান্তি চায়, 'কেউ কারো ওপর আক্রমণ বা চড়াও হওয়ার ইচ্ছা না থাকে এবং উভয় যদি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে আগ্রহী হয়, একে অন্যের অধিকার ও সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে তখনই তাকে শান্তি বলা যেতে পারে। এবং সেই ধরনের শান্তি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু যদি কখনও এক দল আক্রমণ চালায় অন্য দলটি যুদ্ধ খুবই খারাপ এ কারণে আত্মসমর্পণের ও নতি স্বীকারের পথ বেছে নেয় তা হলে তা হবে চরম অবমাননা, চাপানো আগ্রাসনের প্রতি সহনশীলতা। এর নাম শান্তি নয়। এ হচ্ছে অবমাননা, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাকে বরণ করা। শক্তির মুকাবেলায় এ ধরনের নতি স্বীকার কখনও শান্তি হতে পারে না।

শান্তির শ্লোগান আর নতি স্বীকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম কখনও এ ধরনের অবমাননা-লাঞ্ছনাকে মেনে নিতে অনুমতি দেয়নি যদিও ইসলাম শান্তির অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রবক্তা।

আমি বিষয়টির গুরুত্ব জোর দিয়েই উল্লেখ করতে চাই। কেননা খৃষ্টান সম্প্রদায় ও অন্যরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর হাতিয়ার হিসেবে এ বিষয়টিকে গ্রহণ করেছে। তারা রসূল (দঃ) এর জীবন থেকে

www.pathagar.com

একথা প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে যে ইসলাম একটি তরবারীর ধর্ম। তারা এতটুকু পর্যন্ত বলেছে যে, মুসলমানগণ মানুষেক তরবারী ধরে বলতো যে "ইসলাম গ্রহণ কর, না হয় মৃত্যুবরণ কর।" এবং মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ জন্যেই এ বিষয়ে বিস্তারিত ও সুষম দিকগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন। এ আলোচনায় শুধু কোরআনের আয়াতই প্রয়োগ করা হবে না বরং সহী হাদীস ও রসূলের (দঃ) জীবনের ঘটনা প্রবাহেরও সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

জিহাদ সংক্রান্ত শর্তহীন আয়াত

কাফেরদের বিরুদ্ধে পূর্বেই আমি জিহাদ সংক্রান্ত কোরআনের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করেছি যেগুলো হচ্ছে শর্তহীন আয়াত, যার অর্থ হচ্ছে "হে নবী, কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর"। অথবা আর একটি আয়াতের কথা উল্লেখ করা যায় যাতে বলা হয়েছে যে "মুশরিকদেরকে যে সময় (চার মাস) দেয়া হয়েছে সে সময়ের মধ্যে যদি তারা ইসলাম কবুল না করে বা মক্কা ছেড়ে চলে না যায় তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে।" অথবা যে আহলি কিতাবদের সম্পর্কিত আয়াতটি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছি তার কথা উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়াও আর একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন "হে নবী, কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং কঠোরতা প্রদর্শন কর।" (৯ঃ ৭৩)। এখন যদি আমরা এ সমস্ত আয়াতগুলো সামনে রাখি তা আপাতদৃষ্টিতে এ কথা বলা যায় যে, মুসলিমগণকে সদা সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হবে—কাফের ও মুনাফেকদের সাথে কোন প্রকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলবে না। তাদের সঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও কঠোরতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি এভাবেই চিন্তা করি তাহলে একথা বলা যায় যে, কোরআন কোন শর্ত ছাড়াই অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছে।

অবশ্য আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, যখন শর্তহীন ও শর্তযুক্ত উভয় ধরনের নির্দেশ পাওয়া যায় অর্থাৎ একটি স্থানে যদি শর্তহীন নির্দেশ আর অন্য আর একটি স্থানে যদি শর্তযুক্ত নির্দেশ থাকে তাহলে উলামাদের মতে শর্তহীন নির্দেশকে শর্তযুক্ত নির্দেশের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। একটু আগে যে আয়াতটি আমি উল্লেখ করেছি তা একটি শর্তহীন আয়াত। অন্য

www.pathagar.com

অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো হচ্ছে শর্তযুক্ত। সেগুলোর আসল অর্থ হচ্ছে অনেকটা এরকম ঃ 'হে মুসলিমগণ, মুশরিকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেহেতু তারা তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তোমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।" এখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে কোরআনের যেসব স্থানে বলা হয়েছে, 'হে নবী, কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর" তার অর্থ হচ্ছে ঐ সব কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, যতক্ষণ তারা যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে ততক্ষণ আমরাও যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

শর্তযুক্ত আয়াত

সূরা বাকারায় পবিত্র কোরআন আমাদের বলছে, "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং সীমা লংঘন করোনা—সীমা লংঘনকারীদের আল্লাহ্ ভালবাসেন না।

"হে ঈমানদারগণ; তোমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর" অর্থাৎ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর কেননা তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তবে অবশ্যই সীমালংঘন করবে না। এর অর্থ কি? সীমা লংঘন না করার তাৎপর্যই বা কি? স্বাভাবিকভাবেই এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শুধু তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ কর—অন্য কারো সঙ্গে নয় এবং এ যুদ্ধটা করতে হবে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই অর্থাৎ বিশেষ একটা দলের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হবে যাদেরকে অপর পক্ষ যুদ্ধে পাঠাবে, যারা যুদ্ধের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে ময়দানে এসেছে এবং যারা যুদ্ধ করছে তাদের সংগে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে—তাদের মুকাবেলায় নিজেরা মুরগীর মত নতি স্বীকার করলে চলবে না, পালালে চলবে না। আমাদেরকে অবশ্যই তরবারী উত্তোলন করতে হবে। গুলী বিনিময় করতে হবে এবং যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু যারা যুদ্ধে লিপ্ত হয় না, যারা সৈনিক নয় যেমন বৃদ্ধ নারী-পুরুষ বস্তুতঃ সমস্ত নারী তারা বৃদ্ধ হোক আর না হোক এবং যারা শিশু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। তদুপরি আমাদেরকে যে সমস্ত কার্যকলাপ সীমা লংঘন ও অন্যায় বলে বিবেচিত যেমন—গাছবৃক্ষ কেটে ফেলা (অর্থাৎ তাদের অর্থনৈতিক সম্পদ বিনষ্ট করে ফেলা) তা পরিহার করতে হবে। তাদের খালও বন্ধ করা যাবে না। অন্যথায় এগুলো হবে

www.pathagar.com

সীমা লংঘন ও অপরাধ। এখানে এ ভুল ধারণা করা উচিত নয় যে, যুদ্ধ করতে হলে কখনও কখনও বাড়ীঘর, গাছপালা ধ্বংস করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রেও কি তা করা যাবে না? যে সমস্ত ক্ষেত্রে এ অবস্থা ছাড়া যুদ্ধই করা যায় না সেখানকার কথা স্বতন্ত্র এবং তখন এ জাতীয় কার্যকলাপ যুদ্ধেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

সূরা হজ্জের আয়াতটিও একটি শর্তযুক্ত আয়াত। বস্তুতপক্ষে সূরা হজ্জের আলোচ্য পাঁচ-ছয়টি ধারাবাহিক আয়াতের প্রথম আয়াতটি হচ্ছে জিহাদ সংক্রান্ত। তার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে যেহেতু অন্য পক্ষ আমাদের ওপর তলোয়ার উত্তোলন করেছে কাজেই আমাদেরকে এই কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সূরা তওবার আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে "মুনাফিকদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যেমন করে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।" (৯ঃ ৩৬)

মজলুমের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ

উপরোক্ত আয়াতটি ও অন্যান্য আয়াত বিশ্লেষণ করার পূর্বে ভিন্ন আর একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। আমি আগেই বলেছি যে, যুদ্ধের অনুমতি কতকগুলো শর্ত সাপেক্ষে দেয়া হয়েছে। সেসব শর্তগুলো কি? একটি শর্ত হচ্ছে যেমন বিরোধী পক্ষ যুদ্ধ করতে চাইলে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিলে তখন অবশ্যই আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। জিহাদ করার শর্ত কি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? না কি অন্যান্য কারণও রয়েছে? হতে পারে যে অন্য পক্ষ আমাদের সংগে যুদ্ধ করতে চাইলো না, আক্রমণ করলো না কিন্তু তারা মানব জাতির অন্য একটি জনগোষ্ঠীর ওপর জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ শুরু করলো এবং তাদের অত্যাচারের হাত থেকে ঐ নিপীড়িত জনতাকে বাঁচানোর মতো শক্তিও আমাদের রয়েছে, এমন অবস্থায় যদি আমরা তাদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা না করি তাহলে কার্যত ঐ উৎপীড়িতদের বিরুদ্ধে উৎপীড়ককে মূলতঃ সাহায্য করা হয়। আমরা এমন এক অবস্থা অবলোকন করতে পারি যে, কোন গোষ্ঠী হয়তো আমাদেরকে আক্রমণ করেনি কিন্তু তারাই অন্য কোন জনগোষ্ঠীর ওপর অন্যায় ও জুলুমের আচরণ করেছে এবং এ মজলুম জনগোষ্ঠী মুসলিমও হতে পারে আবার অমুসলিমও হতে পারে।

www.pathagar.com

যদি তারা মুসলিম হয়—যেমন আজকে ফিলিস্তিনের মুসলমানগণ যারা নিজেদের আবাসভূমি বাড়ীঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছে, যাদের সহায়-সম্পদ সব কেড়ে নেয়া হয়েছে, যাদের ওপর সব ধরনের অন্যায় করা হয়েছে যদিও জালেমদের এ মুহূর্তে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের কোন ইচ্ছে নেই এমন পরিস্থিতিতে কি ঐসব মজলুম মুসলমানদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে সাহায্য করা বৈধ না অবৈধ ?

অবশ্যই। যদি তারা মুসলিম হয় তাহলে অবশ্যই তা বৈধ। প্রকৃত-পক্ষে তা বৈধই নয় বরং বাধ্যতামূলক, এমনি সহায়তা কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করা নয় বরং মজলুমদেরকে জুলুমের যাঁতাকল থেকে উদ্ধারেরই সংগ্রাম।

কিন্তু মজলুম ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি মুসলিম না হয় তাহলে কি ভূমিকা পালন করতে হবে ? অত্যাচার ও জুলুম দু'ধরনের হতে পারে। কখনও এমন হতে পারে যে, কোন অত্যাচারী কোন জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সারা দুনিয়া জুড়ে তার বাণী প্রচারের অধিকার দিয়েছে কিন্তু তা নির্ভর করছে প্রচারের স্বাধীনতার ওপর।

ধরুন কোন সরকার ইসলামের দাওয়াত দানকারী মুসলমানদেরকে বললো যে, "তোমরা যা বলছো তা বলার অধিকার নেই এবং আমরা তা করতে অনুমতি দেবো না।" এমনি অবস্থায় ঐ জাতির সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি বা ঐ জাতির জনগণের সাথে যারা সচেতন ও সত্য অবহিত নয় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ঐ দুর্নীতিবাজ ও জালেম সরকারের বিরুদ্ধে কি যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে যে তার বিকৃত মতবাদ ও ব্যবস্থা দ্বারা জনগণের ওপর বন্দীদশা চাপিয়ে দিয়ে, তাদেরকে অন্ধ সংকীর্ণতায় নিক্ষিপ্ত করে, সত্যের আওয়াজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের অবৈধ ক্ষমতা ও জুলুমকে টিকিয়ে রাখতে চায় ? যারা সত্যের পথে চরম বাধা সৃষ্টিকারী ঐসব বাধা দূর করার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কি কোন অনুমতি নেই ? ঐসব অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কি বৈধ নয় ? ইসলামের দৃষ্টিতে তা নিঃসন্দেহে বৈধ, কেননা, এ ধরনের যুদ্ধ মূলতঃ জুলুমের ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম। হতে পারে মজলুম জনতা অন্যায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তারা কোন

www.pathagar.com

সাহায্যের জন্যে আবেদন জানায়নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহায্যের আবেদন প্রয়োজন নেই। সাহায্যের জন্যে আবেদন আর একটি বিষয়। মনে করুন মজলুম জনগোষ্ঠী আমাদের কাছে সাহায্য কামনা করলো। এখন কি তাদেরকে সাহায্য করা আমাদের জন্য বৈধ অথবা অপরিহার্য? এমন কি তারা যদি সাহায্যের আবেদন নাও জানায় তখনও তাদেরকে সাহায্য করা বৈধ এমন কি বাধ্যতামূলক? এর জবাব হচ্ছে যে, আমাদের সাহায্যের জন্যে তাদের আবেদনের দরকার নেই। সরল কথা হচ্ছে যে মজলুমরা মজলুমই এবং জালেম সরকার একটি জাতির কল্যাণের পথে, তাদের সচেতন হওয়ার পথে, যে সত্য তাদের জাতীয় জীবনে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এনে দিতে পারতো সে সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পথে তীব্র বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে—দাঁড় করিয়েছে এক কঠিন দেয়াল। আমাদেরকে এ বাধার দেয়াল গুঁড়িয়ে দিতে হবে, উৎখাত করতে হবে ইসলাম ও মজলুম জনগণের মধ্যে বাধা সৃষ্টিকারী ঐ অত্যাচারী সরকারকে।

ইসলামের প্রথমিক যুগে যুদ্ধ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে উপরোক্ত কারণে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। মুসলমানগণ যুদ্ধে গিয়ে একথা বলতেন যে, পৃথিবীর জনগণের সাথে কোন যুদ্ধ ও সংঘাত নেই বরং তাদের মুক্তিকল্পেই ঐসব সরকারের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করছে—যে সরকারগুলো তাদের উপর দুঃখ-কষ্ট ও দাসত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। যখন প্রাগ-ইসলামী যুগের পারস্যের বীর সেনানায়ক রুস্তম মুসলমান সৈনিকগণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি? তখন তারা বলেছিলো "মানুষকে মানুষের দাসত্ব-আনুগত্য ও ইবাদতের হাত হতে উদ্ধার করে আল্লাহ্‌র বান্দায় পরিণত করা।" অর্থাৎ "আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে মুক্ত করা যাদেরকে তোমরা তোমাদের প্রতারণা ও শক্তি দ্বারা দাসত্বের যোয়ালে শৃঙ্খলিত করে রেখেছ। আমরা এসেছি তাদেরকে তোমাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে। আমরা চাই তাদেরকে মুক্ত করে কোন সৃষ্টির আনুগত্যের পরিবর্তে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দায় পরিণত করতে।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক আহলে কিতাবদের উদ্দেশে প্রেরিত পত্র-গুলোতে তিনি বিশেষভাবে পবিত্র কোরআনের এ আয়াত উল্লেখ করতেন ঃ

www.pathagar.com

"বল হে আহলে কিতাব, এসো এমন একটি কথার ওপর যা আমাদের ও তোমাদের উভয়ের জন্যে সমান আর তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবো না, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবো না এবং আমরা একে অন্যকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবো না।" (৩ঃ ৬৪) এ আয়াত স্পষ্টভাবে নবী (দঃ)কে বলে দিচ্ছে যে, আহলে কিতাবদের (যাদের সম্পর্কে জিহাদের নির্দেশও দেয়া হচ্ছে) এমন একটি বিষয়ের দিকে আহবান জানাতে হবে যা তাদের এবং আমাদের উভয়ের জন্যে সমান। এমন কথা গ্রহণ করতে কোরআন বলছে না যে, যা শুধু আমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং শুধু আমাদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। তার আহবান হচ্ছে সবারই জন্যে কল্যাণকর এবং সবার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট বিষয়টি গ্রহণ করা।

যদি উদাহরণস্বরূপ আমরা কারো বলি ঃ এসো এবং আমাদের ভাষা গ্রহণ কর। তখন ঐসব লোকদের অবশ্যই অধিকার রয়েছে একথা বলার যে কেন? আমাদের নিজেদেরই তো একটি ভাষা রয়েছে এরপর তোমাদেরটা গ্রহণ করতে যাবো কেন? যদি আমরা বলি "এসো আমাদের বিশেষ অভ্যাস ও রীতি-প্রথাকে গ্রহণ কর।" তারা তখন বলতে পারে; কেন আমরা অভ্যাস ও রীতি গ্রহণ করবো যেখানে আমাদের নিজস্ব অভ্যাস ও রীতি রয়েছে? কিন্তু যদি আমরা বলি "এসো এমন একটি বিষয় আমরা গ্রহণ করি যা শুধু আমাদেরও নয় তোমাদেরও নয় বরং প্রত্যেকেরই — আল্লাহ্ আমাদের সবার আল্লাহ, অতএব তাকে গ্রহণ কর—একথা আর শুধু আমাদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়। যখন আমরা বলি "তারই শুধু আনুগত্য ও ইবাদত কর যিনি তোমাদের-আমাদের বরং সবারই সৃষ্টিকর্তা।" এ বিষয়টি আমাদের সবার জন্যেই সমান। পবিত্র কোরআন বলছে, "এসো এমন একটি বিষয়ের দিকে যা আমাদের ও তোমাদের জন্যে সমান।" একমাত্র আল্লাহ্ই—যার ইবাদত করা চলে—দাসত্ব করা চলে। আর একটি বিষয়ও রয়েছে যা তোমাদের ও আমাদের উভয়ের জন্যে পরম কল্যাণকর ও লাভ-জনক আর তা হচ্ছে "আমরা একে অন্যকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবো না—" যার অর্থ হচ্ছে 'প্রভু-দাস' এ সামাজিক নিয়ম ও ধারা বাতিল হয়ে গেলো এবং মানুষে মানুষে সাম্যের ধারা প্রতিষ্ঠিত হলো।

এ আয়াত স্পষ্ট করেই বলছে যে, আমরা যদি যুদ্ধ করি তাহলে যুদ্ধ করতে হবে এমন বিষয়ের জন্যে যা সমস্ত মানব জাতির জন্যেই সমান।

www.pathagar.com

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন আমরা বলতে পারি যুদ্ধের অন্যতম শর্ত হিসেবে শর্তহীন আয়াতগুলোতে প্রয়োগযোগ্য শর্ত হচ্ছে যে, যে সমস্ত জনগোষ্ঠী জুলুম-অত্যাচারের সম্মুখীন তাদেরকে মুক্ত করার জন্যে যুদ্ধ করার অনুমতি আমাদের জন্যে রয়েছে।

এখন আমি আরো দুটো আয়াতের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথমটি হচ্ছে সূরা আনফালের ৩৯ নং আয়াত; "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত না ফেতনা দূর হয়ে যায় এবং দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র জন্যেই হয়ে যায়।"

এ আয়াতের অর্থ কি ? এর অর্থ হচ্ছে যে যারা আমাদের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এবং মুসলমানদেরকে আমাদের ধর্ম হতে ফিরিয়ে নিতে চায় আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেতে হবে। আমাদেরকে ঐসব ফেতনা ও নৈরাজ্য দূর না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে। এটি জেহাদের একটি শর্ত। আর একটি সূরা নেসার ৭৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে; "তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এবং ঐসব মুস্তাজাফীন পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্যে যুদ্ধ করছ না..." অর্থাৎ হে মুসলিম, তোমরা কেন আল্লাহ্‌র পথে ও ঐ সব অসহায় লোকদের খাতিরে লড়াই করছ না ? যেখানে পুরুষ, নারী ও শিশুগণ —অত্যাচারিত হচ্ছে, দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত হয়ে আছে সেখানে তোমরা তাদের জন্যে কেন যুদ্ধ করছ না ? তাদের মুক্তিকল্পে কেন তোমরা যুদ্ধ করছ না ?

শর্তহীন আয়াতসমূহকে শর্তযুক্ত আয়াত হিসেবে ব্যাখ্যা করা

উপরোক্ত পাঁচটি আয়াত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যে জেহাদ সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশাবলী কোথাও শর্তহীন আর কোথাও শর্তযুক্ত। এমন অবস্থায় জ্ঞানী ও উলামাগণের মতে শর্তহীন আয়াতগুলোকে শর্তযুক্ত আয়াতের আলোকেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

www.pathagar.com

ধর্মে কোন জোর-জুলুম নেই

পবিত্র কোরআনে অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে — ধর্ম মানুষ গ্রহণ করবে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে—জোর-জুলুমের কারণে নয়। এগুলো থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে - ইসলামের দৃষ্টিকোণ এই নয় যে, লোকদের ওপর আমরা শক্তিপ্রয়োগ করবো এবং বলবো যে হয় মুসলমান হতে হবে নতুবা মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ সমস্ত আয়াতগুলো মূলতঃ শর্তহীন আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা।

এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের আয়াতুল কুরসির (২ ঃ ২৫৫—২৫৭) একটি অংশ খুবই পরিচিত "লা ইকরাহা ফি দ্বীন, ক্বাদ-তাবাইয়ানার রুশদো মিনাল গাইয়্যে—"অর্থাৎ ধর্মে কোন জোর-জুলুম নেই, কেননা সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে।" এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে যে আমরা মানুষের নিকট সত্য ও সঠিক পথকে স্পষ্ট করে তুলে ধরবো তার বাস্তবতাকে প্রকাশ করে দেব। ধর্মে জোর-জবরদস্তি করার কোন সুযোগ নেই—জোর করে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করানোও যেতে পারে না। এ আয়াতটি বক্তব্যের দিক থেকে পবিত্র কোরআনের একটি স্পষ্ট আয়াত। কোরআনের বিভিন্ন তাবসীর গ্রন্থসমূহে এ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন আনসারের দু'জন পুত্র ছিলো যারা পূর্বে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলো। এ দু'পুত্র খৃষ্টধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করে এবং এর জন্যে নিষ্ঠাবান হয়ে যায়। এখন তাদের পিতা মুসলমান হয়েছেন এবং তিনি তার পুত্র খৃষ্টান হওয়ার কারণে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যান। তিনি মহানবীর (দঃ) কাছে গেলেন এবং বললেন হে রসূলুল্লাহ্! আমি আমাদের দু'সন্তান সম্পর্কে কি করতে পারি যারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে? যতই আমি চেষ্টা করেছি তারা মোটেই ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। আপনি কি আমাকে এ অনুমতি দেবেন যে আমি শক্তি প্রয়োগে তাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে ও মুসলমান হতে বাধ্য করবো?" নবী (দঃ) বললেন ঃ না; 'লা-ইকরাহা ফি দ্বীন'—ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই।

যেসব পটভূমিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো তাও লিপিবদ্ধ রয়েছে। আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় মদীনায় বাস করতো এবং তারাই ছিলো মদীনার অধিবাসী। ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তারা কতিপয় ইহুদী গোত্রের

www.pathagar.com

সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করতো। ঐসব ইহুদী গোত্রসমূহ পরবর্তীকালে মদীনায় আসে। গোত্রগুলোর মধ্যে একটি ছিলো বনি নাযল অপরটি ছিলো বনি খারেজা। তাছাড়াও অন্য আর একটি বড় ইহুদী গোত্র বাস করতো।

ইহুদীগণ ইহুদীবাদ ও একটি ঐশী গ্রন্থের অধিকারী হওয়ার কারণে সে সমাজের শিক্ষিত হিসেবে কম-বেশী সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ছিলো। অন্য দিকে মদীনার আদি অধিবাসীরা ছিলো পৌত্তলিক এবং নিরক্ষর। অবশ্য তাদের মধ্যে একটি ছোট্ট দল লেখাপড়া জানতো। ইহুদীগণ তাদের উন্নতি, সংস্কৃতি, প্রসারিত চিন্তাধারার কারণে মদীনার মূল অধিবাসীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলো। আউস এবং খাজরাজ গোত্রের ধর্ম ইহুদীদের চেয়ে ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও ধ্যান-ধারণা ও ভাবধারা দ্বারা তারা প্রভাবিত ছিলো। ফলশ্রুতিতে তারা কখনও কখনও তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে ইহুদীদের নিকট লেখাপড়া করতে পাঠাতো এবং ইহুদীদের পরিবেশ থেকে ঐসব সন্তানরা পৌত্তলিক ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী হয়ে যেত। যখন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) মদীনায় আসলেন, এসব ছেলেদের একটি অংশ ইহুদীদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হচ্ছিলো এবং তারা ইহুদী ধর্মকে তাদের জন্যে পছন্দ করে নিয়েছিলো। অবশ্য এক অংশ স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগে রাজী ছিলো না। এখন পিতা-মাতাগণ ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এসব সন্তানগণ ইহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করতে রাজী হলো না। যখন এটা সিদ্ধান্ত হয় যে, ইহুদীগণ (তাদের নৈরাজ্য সৃষ্টি ও ষড়যন্ত্রের কারণে) মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে হবে তখন ঐসব সন্তানগণও তাদের ইহুদী সঙ্গীদের সঙ্গে চলে যায়। তাদের পিতাগণ রসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) নিকট আসলেন এবং তাদের সন্তানদেরকে ইহুদীদের থেকে পৃথক করে দিতে এবং তাদেরকে ইহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু মহানবী (দঃ) তাদেরকে এ অনুমতি দেননি। তারা বলেন, "হে রসূলুল্লাহ! আমাদেরকে অনুমতি দিন যেন আমরা তাদেরকে তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে ও ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারি।" মহানবী (দঃ) তাদেরকে বললেন—না, যখন তারা ইহুদীদের সঙ্গে যাওয়াটাই পছন্দ করেছে তখন তাদেরকে তাদের সঙ্গে যেতে দাও।" মুফাস্‌সিরগণ বলেন যে তখনই এ আয়াত নাযিল হয়, "লা-ইকরাহা ফি দ্বীন-ক্বাত্‌তাবাইয়্যানার রুশদো মিনাল গাইয়্যে।"

www.pathagar.com

অন্য একটি প্রসিদ্ধ আয়াত হচ্ছে ঃ' 'তোমার রবের দিকে ডাকো হিকমত ও সদোপদেশ সহকারে এবং উত্তমভাবে তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর।" (১৬ ঃ ১২৫)

লোকদেরকে তাদের রবের পথে আহবান জানাও। কিন্তু কিভাবে? শক্তি প্রয়োগ করে? "উত্তম নসিহত সহকারে এবং সুন্দরভাবে তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর....." যারা আমাদের সঙ্গে মতবিরোধ করবে তাদের সঙ্গে উত্তমভাবেই মতবিরোধ কর। একইভাবে এ আয়াতে ইসলামের জন্যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থাও বলে দিচ্ছে।

অন্য আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে "তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে এখন যার ইচ্ছে তা গ্রহণ করুক আর যার ইচ্ছে একে প্রত্যাখ্যান করুক।" (১৮ ঃ ২৯) যে ঈমানদার হতে চায় সে ঈমানদার হবে আর যে কাফের হতে চায় সে কাফের হবে। এ আয়াতও এটাই বলে দিচ্ছে যে, বিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান ঈমান ও কুফর ব্যক্তি নিজেই বাছাই করবে, এগুলো জোর করে কারও ওপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। অতএব ইসলাম কাউকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করতে বলে না। যদি কেউ মুসলিম হতে চায় এটা ভালো কিন্তু যদি কেউ মুসলমান না হতে চায় তাহলে তাকে হত্যা করা চলবে না—কারণ গ্রহণ করা না করা তাদের পছন্দের ব্যাপার। ইসলাম বলছে যে কেউ ঈমানদার হতে চায় তা করতে পারে আবার যে কেউ করতে না চায় তাও পারে।

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তোমার রবের ইচ্ছাই যদি এই হতো (যে জমীনের সব মানুষই মুমিন ও অনুগতই হবে।) তাহলে দুনিয়ার সব অধিবাসীই ঈমান আনতো। তবে তুমি কি লোকদের মুমিন হওয়ার জন্যে জবরদস্তি করবে।" এ আয়াতে নবী করীম (দঃ) কে সম্বোধন করা হয়েছে। মহানবী (দঃ) সত্যিকারভাবে মানুষকে ভালোবাসতেন এবং তারা সত্যিকার ঈমানদার হোক তা তিনি চাইতেন। পবিত্র কোরআন বলছে যে, ঈমানের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ অর্থহীন। যদি শক্তি প্রয়োগ করা সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হতো তাহলে আল্লাহতায়ালা নিজেই তাঁর সৃষ্ট ক্ষমতা বলে সমস্ত মানুষকে ঈমানদার বানাতে পারতেন কিন্তু ঈমান এমন এক জিনিস যা মানুষ নিজেই বাছাই করবে। অতএব যে কারণে আল্লাহ্ তার সৃষ্ট ক্ষমতা বলে জোর

www.pathagar.com

করে মানুষকে ঈমানদার হতে বাধ্য করেননি বরং তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন যে কোন একটি বাছাই করার জন্যে, ঠিক সে কারণেই নবী (দঃ) এর উচিত মানুষকে তাদের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া। যার ইচ্ছে ঈমানদার হবে যার ইচ্ছে হবে না।

অন্য একটি আয়াতে নবী করীম (দঃ) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—"তুমি হয়তো এ চিন্তায় প্রাণ বিনষ্ট করে দেবে যে এ লোকেরা ঈমান আনছে না।" (২৬ ঃ ৩) "হে নবী! মনে হচ্ছে তুমি যেন তারা ঈমান গ্রহণ করছে না এ চিন্তায় নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছ। তাদের জন্যে এতটা চিন্তিত হয়ো না। যদি সৃষ্ট ক্ষমতা বলে জোর করেই ঈমান গ্রহণ করাতে চাইতেন তাহলে আল্লাহ্ অতি সহজেই তা করতে পারতেন।" "আমরা চাইলে আকাশ হতে এমনসব নিদর্শন নাযিল করতে পারি যার সম্মুখে তাদের মাথা নত হয়ে যাবে।" (২৬ ঃ ৪) এখানে আল্লাহ্ বলছেন যে তিনি যদি আকাশ থেকে নিদর্শন পেশ করতে চাইতেন, এ শাস্তি আরোপ করতে চাইতেন এবং লোকদেরকে বলতেন হয় তোমরা ঈমানদার হবে নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন সমস্ত মানুষ চাপের মুখে ঈমানদার হয়ে যেত কিন্তু তিনি তা চান না কারণ তিনি চান মানুষ স্বাধীনভাবে নিজেরাই বাছাই করে নিক।

এ সমস্ত আয়াতসমূহ আরো পরিষ্কারভাবে জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে। ইসলামে জিহাদের লক্ষ্য তা নয় যা একদল স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা লোকেরা মনে করে বসে আছে। এ সমস্ত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে ইসলামের লক্ষ্য বাধ্য করা বা জোর করা নয়—এটা মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছে না যে অমুসলমানদের ওপর তলোয়ার ধরে বলতে হবে যে—ইসলাম, নয় মৃত্যু; নয় তা নয় এবং জিহাদের উদ্দেশ্য এসব কিছু নয়।

শান্তি

পবিত্র কোরআনে আরো কতক আয়াত এমন রয়েছে যার উল্লেখ করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে ইসলাম শান্তির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। একটি আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে "ওয়াস সুল্হ খায়রুন"—

www.pathagar.com

'শান্তি' (সন্ধি) সর্বোত্তম (৪ ঃ ১২৮) কিন্তু পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে শান্তি মানে যুদ্ধ, দুঃখ-কষ্ট ও জালেমের নিকট আত্মসমর্পণ নয়। অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "হে ঈমানদারগণ তোমরা পূর্ণরূপেই শান্তির (ইসলাম) মধ্যে প্রবেশ কর। (২ ঃ ২০৮)

কিন্তু এর চেয়েও স্পষ্ট করে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "যদি তারা শান্তির জন্যে আগ্রহী হয় তবে তুমিও এর জন্যে আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা কর।" (৮ ঃ ৬১) এখানে নবী করীম (সঃ) কে বলা হয়েছে যে—যদি শত্রু বিরোধী পক্ষ শান্তি কামনা করে, আন্তরিকভাবে শান্তির জন্যে প্রয়াসী হয়—তাহলে তাকেও শান্তি স্থাপনে এগিয়ে আসতে হবে। তারা যদি আন্তরিকভাবে শান্তি কামনা করে তিনি তা কামনা করবেন। এ আয়াতগুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই তুলে ধরছে যে ইসলামের আত্মা মূলতঃ শান্তিরই আত্মা।

সূরা নেসার একটি আয়াতেও নবী করীম (দঃ) কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, "যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে প্রত্যাহৃত হয় ও লড়াই থেকে বিরত থাকে এবং তোমাদের দিকে শান্তির হাত প্রসারিত করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করার কোন পথ রাখেননি।" (৪ ঃ ৯১) অর্থাৎ হে নবী (দঃ) যদি তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে যায় এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে বিরত থাকে এবং যদি তারা শান্তির জন্যে আগ্রহী হয় তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন না।"

একই সূরায় মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলছেন যে ঃ

"যদি তারা পালিয়ে যায় তাহলে যেখানে পাবে সেখানেই তাদেরকে ধরবে, হত্যা করবে এবং তাদের মধ্য হতে কাকেও বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবে না।" অবশ্য সেসব (মুনাফিক) লোক যারা তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির সঙ্গে মিলিত হয়, যারা তোমাদের নিকট আগেও লড়াই-সংঘর্ষে উৎসাহী নয় এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় না এবং তাদের জাতির বিরুদ্ধেও নয়।" (৪ ঃ ৮৯-৯০) অর্থাৎ যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধরত মুনাফিকরা পালিয়ে যায়, তাদেরকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই পাকড়াও করতে হবে এবং হত্যা করতে হবে, তাদের কাকেও বন্ধু-রূপে গ্রহণ করা যাবে না, তাদের সাহায্য-সহযোগিতাও নেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

কিন্তু এর ব্যতিক্রম হচ্ছে ঐ সব মুনাফেকরা যারা আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং যারা আমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত। তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। এবং যারা যুদ্ধ করতে অনাগ্রহী তাদের সঙ্গেও লড়াই করা চলবে না।

অতএব, এ পর্যন্ত আমরা চার ধরনের আয়াত পাচ্ছি। এক ধরনের আয়াতে আমাদেরকে শর্তহীনভাবে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে এবং অন্যসব বাদ দিয়ে যদি কেবল এ ধরনের আয়াতই শ্রবণ করি তাহলে এটা মনে করা সম্ভব যে ইসলাম একটি যুদ্ধেরই ধর্ম। দ্বিতীয় ধরনের আয়াতসমূহে নির্দিষ্ট কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমন, বিরোধী পক্ষ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে অথবা কোন মুসলিম বা অমুসলিম জাতি কোন গোষ্ঠী কর্তৃক নিগৃহীত হচ্ছে এবং যারা কারো স্বাধীনতা ও অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তৃতীয় ধরনের আয়াতগুলোতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ইসলামের বাণীর প্রচার শক্তি প্রয়োগ করে করা যাবে না। চতুর্থ ধরনের আয়াতসমূহ ইসলামের শান্তিনীতি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করেছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় বক্তৃতা প্রতিরক্ষা ঃ জিহাদের সারকথা

এখন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে যে যুদ্ধের সারকথা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? গবেষকদের মধ্যে এ ব্যাপারে পূর্ণ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে জিহাদের সারকথা হচ্ছে প্রতিরক্ষা। অর্থাৎ পণ্ডিতদের মধ্যে কেউই এ ব্যাপারে সন্দেহ পর্যন্ত করেননি যে জিহাদ বা যে কোন ধরনের যুদ্ধ যা আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে করা হয়, ধন-সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদের লোভ থেকে উদ্বুদ্ধ এবং কোন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বা মানবীয় সম্পদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় তা কোনক্রমেই ইসলামে অনুমোদিত নয়। ইসলামে এ ধরনের যুদ্ধ মূলতঃ জুলুম—অত্যাচার ও নির্যাতনেরই নামান্তর। জিহাদ একমাত্র প্রতিরক্ষার জন্যে করা হবে এবং বস্তুতঃ এ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সীমালংঘনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তাই তা নিশ্চিত বিধিসম্মত হবে। অবশ্য তৃতীয় এক ধরনের যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে যা আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে করা হয় না বা আত্মরক্ষা অথবা মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার উদ্দেশ্যেই করা হয় না বরং মানবিক মূল্যবোধ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে করা হয়—এ বিষয়টি আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো। এ দিকটি আপাত বাদ দিলে একথা বলা যায় যে গবেষকদের মধ্যে জিহাদের মৌলিক সংজ্ঞার ব্যাপারে এ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে জিহাদ বা যুদ্ধ প্রতিরক্ষার্থেই সংঘটিত হবে। অবশ্য ছোট-খাট বিষয়ে কিছু মতপার্থক্যও রয়েছে এবং সেগুলো হচ্ছে কি প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে হবে সে সব সংশ্লিষ্ট।

প্রতিরক্ষার বিভিন্ন দিক

এ বিষয়ে কারো কারো মতামত সীমাবদ্ধ। তারা বলেন যে প্রতিরক্ষা মানে আত্মরক্ষা। তাদের মতে কোন ব্যক্তি গোত্র বা জাতির আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্যেই যুদ্ধ বৈধ ও বিধিসম্মত। সে মতানুসারে যদি কোন জনগোষ্ঠীর জীবন অন্য কোন জনগোষ্ঠীর দ্বারা বিপন্ন হয় তখন জীবনের প্রতিরক্ষার জন্যে যুদ্ধ বৈধ রয়েছে। একইভাবে যদি তাদের

www.pathagar.com

ধন-সম্পত্তি বিপন্ন হয় তখন মানবিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে তা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবেই যদি কোন জাতি অন্য কোন জাতি কর্তৃক আগ্রাসনের সম্মুখীন হয় এবং আগ্রাসী জাতি তাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নিতে চায় এবং কোন না কোনভাবে কেড়ে নিয়েও যায় তখন অবশ্যই আক্রান্ত জাতির এ অধিকার রয়েছে—শক্তি দিয়ে হলেও তাদের এ ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা।

ইসলাম বলছে যে, যে ব্যক্তিই তার সম্পত্তি বা উপকরণ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ। তাই ইসলামে কারো উপায় উপকরণ রক্ষা যা মূলতঃ কারো জীবন ও সম্পত্তিরই শামিল। এমন কি তা উৎকৃষ্টতর। এটা হচ্ছে কারো সম্মান রক্ষা করা। একটি জাতির জন্যে তার স্বাধীনতা রক্ষা করা নিঃসন্দেহে বিধিসম্মত। তাই যখন কেউ কোন জাতির স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চায় এবং সেই জাতিকে কারো অধীনে রাখতে চায় তখন যদি সেই জাতির জনগণ তাদের প্রতিরক্ষার জন্যে অস্ত্র হাতে তুলে নেয় তা হলে তা হবে বিধিসম্মত। প্রকৃত পক্ষে তা হবে প্রশংসাব্যঞ্জক-সম্মানজনক কাজ।

অতএব জীবন, ধন-সম্পদ, জমি-জমা, স্বাধীনতা, উপায়-উপকরণ এ সব কিছু প্রতিরক্ষা নিশ্চিতভাবে বিধিসম্মত প্রতিরক্ষা, নিঃসন্দেহে এসব ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা অনুমোদিত। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে শুধু শান্তির কথাই বলবে, যুদ্ধের কোন অনুমতি দেবে না, যুদ্ধ সর্বাবস্থায়ই মন্দ এবং শান্তি সর্বাবস্থায়ই উত্তম কোন কোন খৃষ্টানদের এ জাতীয় ধারণার পিছনে না আছে কোন সত্য না আছে কোন যুক্তি। প্রতিরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করা মন্দ নয় বরং চরমভাবেই উত্তম এবং মানব জীবনের জন্যে অন্যতম মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়। পবিত্র কোরআনে এ কথারই প্রতিধ্বনি করা হয়ে বলা হয়েছেঃ "যদি আল্লাহ্ মানব জাতির এক দল দ্বারা আরেক দলকে দমন না করতেন তাহলে পৃথিবীটা ফেতনা-ফাসাদে ও অরাজকতায় ভরে যেত। (২ঃ২৫১)। অন্যত্র "যদি আল্লাহ্ মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা দমন না করতেন তাহলে মঠ-মন্দির, গীর্জা এবং মসজিদ যেখানে আল্লাহ্র নাম বেশী বেশী স্মরণ করা হয় তা সবই ধ্বংস হয়ে যেত।" (২২ঃ৪০) এ পর্যন্ত সমস্ত পণ্ডিতগণ কমবেশী সবাই একমত।

www.pathagar.com

একটি প্রশ্ন এমনও রয়েছে যে কোন ব্যক্তি-গোষ্ঠী বা জাতির অধিকার জাতীয় বিষয়গুলো প্রতিরক্ষার জন্যেই আমাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে, না কি অন্যসব বিষয়ও প্রতিরক্ষার জন্যে আমাদের জন্য বৈধ ? এমন কিছু কি রয়েছে যার প্রতিরক্ষায় অগ্রসর হওয়া আমাদের জন্যে অপরিহার্য ও বাধ্যতা-মূলক অথচ তা শুধু ব্যক্তি, গোত্র বা কোন জাতির অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদি কোথাও মানবিক অধিকার লংঘিত হয় সেক্ষেত্রে কি মৌলিক মানবিক অধিকার রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করা বৈধ রয়েছে ? মানবিক অধিকার রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করা কি বৈধ না নিষিদ্ধ ?

কেউ হয়তো ভাবতে পারে "মানবতার জন্যে যুদ্ধ করা বলতে কি বুঝায় ?" "আমি আমার ব্যক্তিগত বড় জোর জাতির অধিকার রক্ষার জন্যে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন কারণে যুদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করি না।" মানবিক অধিকার নিয়ে মাথা ঘামানো আমার কি প্রয়োজন রয়েছে ? এ জাতীয় চিন্তাধারা যে গ্রহণযোগ্য নয় তা খুবই স্পষ্ট।

ব্যক্তি বা জাতির অধিকারের উর্ধেও অনেক কিছু রয়েছে। মানবিক বিবেকের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিরক্ষার চেয়েও অধিকতর উন্নত ও পবিত্র এমন কিছু অধিকার রয়েছে যার প্রতিরক্ষার জন্যে চেষ্টা চালানো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও উন্নত বিষয়। অন্য কথায় প্রতিরক্ষার পবিত্রতা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার মধ্যে নিহিত নয় বরং "অধিকার" রক্ষার মধ্যে নিহিত। যেখানে "অধিকার"ই মূল কারণ সেখানে ব্যক্তিগত অধিকার ও মানবতার সাধারণ অধিকারের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির কি হেতু থাকতে পারে ? বস্তুতঃ মানবিক অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি অধিকতর পবিত্র বিষয় যদিও অনেক সময় মুখে তা স্বীকার করা হয় না কিন্তু কার্যক্ষেত্রে খোলাখুলি স্বীকৃতি দেয়া হয়।

উদাহরণস্বরূপ, স্বাধীনতাকে অন্যতম মানবিক মূল্যবোধরূপে গণ্য করা হয়। এখানে স্বাধীনতা শুধু একজন ব্যক্তি বা একটি জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখন যদি আমাদের নিজস্ব স্বাধীনতা বা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লংঘিত না হয় অথচ পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে কারো স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হলো যা মূলতঃ মানবিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত, এমতাবস্থায়

www.pathagar.com

নিছক মানবিক অধিকার সংরক্ষণের খাতিরে চেষ্টা কি আমাদের জন্য বৈধ অথবা নয়? এ প্রশ্নটি সম্পর্কে ভেবে দেখুন। যদি তা বৈধ হয় তাহলে প্রতিরক্ষার বৈধতা শুধু বিপদগ্রস্ত ও আক্রান্ত জাতির জন্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য ব্যক্তি বা জাতির জন্যেই স্বাধীনতা রক্ষার্থে সহযোগিতায় এগিয়ে আসা, স্বাধীনতা বিরোধী ও নিষ্পিষ্টকারী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অবশ্যই বিধিসম্মত এমন কি অপরিহার্য। আপনার উত্তর কি হতে পারে? আমার মনে হয় না যে এমন কেউ আছে যার এ কথায় সন্দেহ রয়েছে যে পবিত্রতম জিহাদ হচ্ছে মানবতার ও মানবাধিকার রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করা।

ফরাসী উপনিবেশবাদের সঙ্গে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে একদল ইউরোপীয় লোক যুদ্ধে আলজেরিয়াকে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অংশ নেয়ার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। আপনারা কি মনে করেন যে, আলজেরীয়গণ যাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিলো শুধু তাদের পক্ষেই যুদ্ধ করা বৈধ ছিলো আর সুদূর ইউরোপ থেকে যারা আলজেরীয়গণের স্বপক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছিলো তাদের এহেন কার্যকলাপ সীমালংঘন ও আগ্রাসী তৎপরতা ছাড়া কিছু নয়? তাদেরকে কি এ বলা অসংগত হতো যে "তোমাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ কর এতে তোমাদের কাজ কি? তোমাদের অধিকার কেউ লংঘন করেনি তা হলে তোমরা এখানে যুদ্ধ করতে এসেছ কেন?" অথবা এ কথা কি বলা যায় যে, এ সমস্ত লোকদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ আলজেরীয়দের যুদ্ধ থেকে অধিকতর পবিত্র কেননা, আলজেরীয়রা যুদ্ধ করছে তাদের নিজদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্যে আর এ লোকগুলো যে কারণে যুদ্ধ করছে তা হচ্ছে উন্নততর নৈতিকতামণ্ডিত ও অধিকতর পবিত্র। স্পষ্টতঃ দ্বিতীয় ধরনের অনুমানই গ্রহণযোগ্য।

যারা স্বাধীনতা প্রিয়—বাস্তবে হোক বা মুখে মুখে হোক তারা সবাই সাধারণ শ্রদ্ধা অর্জন করে থাকেন। এ শ্রদ্ধা সব জাতির লোকেরাই প্রদর্শন করে থাকে আর তার কারণ হচ্ছে যে তারা ব্যক্তিগত বা নিজের দেশ এমন কি শুধু নিজের মহাদেশেরই নয় বরং মানবতার অধিকার সংরক্ষণ-যোদ্ধার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যদি তারা কখনও কথা, লেখা, চিঠিপত্র, বক্তৃতা ছাড়াও কার্যতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যান এবং উদাহরণস্বরূপ ফিলিস্তিন বা ভিয়েতকংদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করেন তাহলে বিশ্ববাসী একে অত্যন্ত পবিত্র

www.pathagar.com

কাজ মনে করবে। তাদেরকে এ বলে তিরস্কার করবে না যে "তোমরা এখানে হস্তক্ষেপ করছ কেন? এতে তোমাদের কাজ কি? কেউ তো তোমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে না?"

পৃথিবী সর্বদাই প্রতিরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করাকে পবিত্র বিবেচনা করে এসেছে যদি তা আত্মরক্ষার্থে হয় তা হলে তা পবিত্র। যদি তা জাতীয় প্রতিরক্ষা হয় তবে তা অধিকতর পবিত্র। কেননা যুদ্ধের কারণটি ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং একজন ব্যক্তি শুধু আত্মরক্ষারই চেষ্টা করছে না বরং তার সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতিরক্ষারও চেষ্টা করছে। এখন যদি কারণটা জাতীয় পর্যায় থেকে মানবতার পর্যায়ে উন্নীত হয় তা হলে তা আরো অধিকতর পবিত্র রূপ ধারণ করবে।

ছোট-খাট মতপার্থক্য

জিহাদ সম্পর্কে মতপার্থক্যের প্রকৃতি নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। তবে এ মতবিরোধ তেমন কোন বড় বিষয়ে নয় বরং ছোট একটি বিষয়ে। এ বিরোধ জিহাদ শুধু প্রতিরক্ষার জন্যেই বৈধ অথবা অন্য কারণেও বৈধ এ নিয়ে নয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, জিহাদ শুধু প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেই বৈধ। তবে মতবিরোধ হচ্ছে প্রতিরক্ষার সংজ্ঞা নিয়ে। এ মত বৈধ হচ্ছে প্রতিরক্ষা মানে কি শুধু আত্মরক্ষা বা বড় জোর জাতীয় প্রতিরক্ষা না কি মানবতার প্রতিরক্ষার প্রশ্নটিও এর আওতায় পড়ে?

কেউ কেউ বলছেন এবং তারা যথার্থই বলছেন যে, মানবতার প্রতিরক্ষাও একটি বিধিসম্মত প্রতিরক্ষা, কাজেই যারা "সৎ কাজের আদেশ করার আর মন্দ কাজে নিষেধ করার" দায়িত্ব পালনে দাঁড়িয়ে যায় তাদের লক্ষ্য একটি পবিত্র লক্ষ্য। হতে পারে কারো ব্যক্তিসত্তায় হস্তক্ষেপ করা হলো না, বরং সে ব্যক্তি উচ্চ সম্মানের অধিকারী এবং তার জন্যে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণেরও অভাব নেই। তাছাড়া তার জাতির বৈষয়িক অধিকারও সংরক্ষিত হচ্ছে এরপরও মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক মানবীয় অধিকার লংঘিত হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ তার সমাজে যদিও সে সমাজের বৈষয়িক বা ব্যক্তিগত অধিকারসমূহের ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না তবুও মানবতার সর্বোত্তম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন কিছু সেখানে নিহিত

www.pathagar.com

থাকতে পারে। যেমন, ভালো ও মন্দ দুটো পৃথক বিষয় এবং ভালোকে প্রতিষ্ঠিত করা ও মন্দকে দূরীভূত করার বিষয়টিও। এখন কোন ব্যক্তি দেখতে পেল যে ঐ সমাজে সৎ ও ভালোকে মন্দ ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য বিবেচনা করা হচ্ছে আবার যা কিছু মন্দ ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য তাকে ভালো ও কল্যাণের স্থান দেয়া হচ্ছে সে ক্ষেত্রে যদি ঐ ব্যক্তি সৎ ও ভালো কাজে আদেশ দেয়ার জন্যে এবং মন্দ ও অকল্যাণ কাজকে দূর করার জন্যে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ঐ ব্যক্তির প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার কাজটিকে কি বলা হবে? সে কি প্রতিরক্ষা করছে? তার ব্যক্তিগত অধিকার? না। তবে কি তার সমাজের কোন বৈষয়িক অধিকার? তাও না। বৈষয়িক কোন অধিকার রক্ষার সংগ্রাম সে করছে না। সে যা রক্ষার সংগ্রাম করছে তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক অধিকার রক্ষার জিহাদ। এ আধ্যাত্মিক অধিকার শুধু বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় বরং গোটা মানবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এমন অবস্থায় আমরা কি তার এ জিহাদকে নিন্দা করবো না কি তাকে পবিত্র ও উত্তম বলে মনে করবো? নিঃসন্দেহে তাকে উত্তম বিবেচনা করবো, কেননা এ জিহাদ হচ্ছে মানবতার অধিকার রক্ষার জিহাদ।

স্বাধীনতার প্রশ্নটিই বিবেচনা করা যাক। আপনারা দেখবেন বর্তমান যুগে যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধেই কার্যতঃ যুদ্ধ করছে তারাও শ্রদ্ধা কুড়ানোর জন্যে নিজেদেরকে স্বাধীনতার যোদ্ধা বলে জাহির করছে। কেননা তারা জানে যে স্বাধীনতা এমন এক জিনিস যার জন্যে সংগ্রাম করা অত্যন্ত মহৎ ও পবিত্র কাজ বলে বিবেচিত। যদি তারা সত্যিই স্বাধীনতা রক্ষায় যুদ্ধ করতো তাহলে তা হতো নিঃসন্দেহে যথার্থ কিন্তু তাদের সীমালংঘনমূলক কাজকেই মূলতঃ স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ নাম দিচ্ছে। তবুও তাদের মাধ্যমে এ কথার স্বীকৃতি মেলে যে মানবতার অধিকার সংরক্ষণ এমন একটি বিষয় যার প্রতিরক্ষায় এগিয়ে যাওয়া প্রশংসাযোগ্য যার জন্যে যুদ্ধ করা বিধিসম্মত ও কল্যাণকর।

www.pathagar.com

তওহীদঃ ব্যক্তিগত অধিকার না সাধারণ অধিকার ?

এখন আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—"তওহীদ" তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে মনোনিবেশ করতে হবে। তওহীদ মানবতার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত না কি ব্যক্তিগত অধিকারের বিষয় ? একজন মুসলিম হয়তো এ কথা বলতে পারে যে, তওহীদ মানবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং ব্যক্তিগত অধিকার বড়জোর একটি জাতির আভ্যন্তরীণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি তওহীদপন্থী হতে চান তিনি তা হতে পারেন আর কেউ যদি মুশরিক হতে চান তাও তিনি হতে পারেন। যদি কেউ তওহীদবাদী হন তাহলে তাতে বাধা সৃষ্টি করার কারো অধিকার নেই, কেননা এটা তার ব্যক্তিগত অধিকার আবার কেউ যদি শের্কবাদী বা অংশীবাদী হয়ে পড়ে এটাও তার ব্যক্তিগত অধিকার মাত্র। তওহীদকে কোন জাতির অধিকার যারা মনে করেন তারা হয়তো বলতে পারেন যে আইন ও বিধি-বিধান বিষয়ে একটি জাতির তিনটি অবস্থা হতে পারে। একটি হচ্ছে যে, সে জাতি তওহীদকে সরকারী ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করবে এবং সরকারীভাবে অন্য কোন ধর্মকে স্বীকার করা হবে না। দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে যে, সে জাতি শের্ক বা কোন ধরনের অংশীবাদকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূপে গ্রহণ করবে। আর তৃতীয় অবস্থাটি হচ্ছে যে সে জাতি প্রত্যেককে তার পছন্দমতো ধর্ম বা মতবাদ গ্রহণের অধিকার দেবে। যদি তওহীদ কোন জাতির আইনের ভিত্তি হয় তাহলে তওহীদ হবে সে জাতির অধিকারের অন্তর্ভুক্ত আর অন্যথায় তওহীদ জাতীয় অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটি একটি দৃষ্টিকোণ। অন্যভাবেও বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে যে তওহীদ হচ্ছে স্বাধীনতার মতো একটি বিষয় এবং তা মানবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতা সম্পর্কে আমরা বলেছি যে স্বাধীনতার অধিকার মানে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা শুধু কোন দিক থেকে বিপন্ন হবে না শুধু তা নয়, কেননা সেই ব্যক্তির দ্বারাই তা বিপন্ন হতে পারে। অতএব যদি কেউ তওহীদের জন্য শের্কের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের এ লড়াই প্রতিরক্ষার জন্য—কোন অধীনতা জুলুম বা সীমালংঘনের জন্যে নয়। এগুলোই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু মতপার্থক্য। এমন কি ইসলামের বিজ্ঞ

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের মধ্যেও দুটো মত রয়েছে। এক দল বলছেন যে তওহীদ হচ্ছে সাধারণ মানবিক অধিকার কাজেই তওহীদের জন্যে যুদ্ধ করা অবশ্যই বিধিসম্মত, কারণ এটা হচ্ছে মানবিক অধিকার সংরক্ষণে এবং তা অন্য জাতির স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করারই মতো। অন্য একটি দল এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের কথা হলো যে তওহীদ হচ্ছে ব্যক্তিগত অধিকারের বিষয় বড় জোর জাতির অধিকারের ব্যাপার। কিন্তু তা কোন-ক্রমেই মানবতার অধিকারের বিষয় নয়। তাই তওহীদের জন্যে অন্যদেরকে কষ্ট দেয়ার কোন অধিকার কারো নেই। এ দু'মতের কোন্‌টা সঠিক ?

এ ব্যাপারে আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত পেশ করতে চাই। এরও আগে অন্য একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই এবং সম্ভবতঃ সিদ্ধান্তে পৌঁছালে দেখা যাবে দুটো বিষয়ই মূলতঃ এক হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হচ্ছে কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করানো যেতে পারে আবার কিছু বিষয় এমন রয়েছে সেগুলো স্বাধীনভাবে বাছাই করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ মনে করুন কেউ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং তার জন্যে ইনজেকশন দেয়া প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে এটা সম্ভব যে তাকে জোর করে ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে, যদি সে ব্যক্তি ইনজেকশন গ্রহণে রাজী না হয় তাহলে অন্যরা জোর করে তার হাত-পা বেঁধে এবং সে ব্যক্তি খুব বাধা দিলে তাকে অচেতন করেও ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে। এটা এমন বিষয় যা জবরদস্তি করে গ্রহণ করানো যায়। এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা জোর করে বাধ্যতামূলকভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করানো যায় না। যেমন উদাহরণস্বরূপ আত্মশুদ্ধির এবং আচরণ ও ব্যবহারকে সুন্দর করার কথা উল্লেখ করা যায়। আমরা যদি মানুষের চরিত্রকে সুন্দর করতে চাই যাতে করে তারা পুণ্যকে পুণ্য, পাপকে পাপ বলে বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারে এবং মানবিক দোষগুলো থেকে বেঁচে থাকার ও তার প্রতি ঘৃণা জন্মানো ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তা চাবুক লাগিয়ে করা সম্ভব নয়—সম্ভব নয় কোন ধরনের শক্তি প্রয়োগ করে।

চাবুকের মাধ্যমে কাকেও হয়তো চুরি করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারে কিন্তু এর মাধ্যমে কারো মধ্যে বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কেননা যদি তা সম্ভব হতো, তাহলে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক সংশোধনের প্রয়োজন হলে তাকে এনে একশ' ঘা বেত

www.pathagar.com

মারলেই সে ব্যক্তি সভ্য হয়ে যেতে পারতো। সুশিক্ষাদানের পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগে কাজ হলে একজন শিক্ষক শুধু বেত ব্যবহার করলেই পারতেন এবং এভাবে বলতে পারতেন যে, "এ ব্যক্তির মধ্যে মিথ্যার প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব ও ঘৃণা জন্মানো এবং জীবনভর বিশ্বস্ততা সৃষ্টির জন্যে একে একশ' বেত মারা প্রয়োজন। তাহলে সে জীবনে কখনও আর মিথ্যা বলবে না।

এখন আমরা উপরোক্ত চিন্তার আলোকে আমাদের চিন্তাকে সতেজ করতে পারি। এখানে আমি বলতে চাই ঈমান তা মৌলিক মানবিক অধিকার হোক বা না হোক এর প্রকৃতিই এমন যে জোর-জবরদস্তি করে একে গ্রহণ করানো যায় না। মনে করুন আমরা ঈমানকে বাস্তবে অস্তিত্ব-শীল দেখতে চাই—কিন্তু ঈমান অধিকারের কোন বিষয় নয়। ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস ও অনুরাগের নাম। ঈমান হচ্ছে কোন চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তাকে গ্রহণ করা। কোন চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মানে দুটো শর্ত পূরণ হওয়া। একটি শর্ত হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি মানবিক চিন্তাধারার বুদ্ধিবৃত্তিক মানদণ্ডের সঙ্গে সংগতিশীল হতে হবে, যুক্তি-বুদ্ধি তাকে গ্রহণ করতে পারবে এবং অন্য শর্তটি হচ্ছে যে মানব হৃদয়েও তার একটা আবেদন থাকবে যাতে করে এর প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয়। এর কোনটাই শক্তি প্রয়োগের ব্যাপার নয়। প্রথম শর্তটির ক্ষেত্রে এটা শক্তি প্রয়োগে সম্ভব নয় এ জন্যে যে চিন্তাধারা যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়—যদি কেউ কোন শিশুকে গাণিতিক কোন সমস্যার সাধারণ শিক্ষা দিতে চায় তাহলে তাকে যুক্তি প্রয়োগেই তা করতে হবে যাতে করে এতে তার বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, কিন্তু তা বেত মেরে শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তার যুক্তি-বুদ্ধি শুধু শক্তি প্রয়োগের কারণেই তা গ্রহণ করতে চাইবে না—যতই আঘাত করা হোক না কেন। দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য যে অনুরাগ, আকর্ষণ ও ভাবাবেগ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। এদিক থেকে মানবিক অধিকার হিসেবে তওহীদ ও তওহীদ ব্যতিরেকে অন্যান্য বিষয় যেমন স্বাধীনতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। স্বাধীনতা এমন একটি বিষয় যা শক্তি প্রয়োগে কাকেও প্রদান করা সম্ভব কেননা সীমা-লংঘন ও জুলুম-অত্যাচার শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। সহজাতভাবেই মানুষ স্বাধীন। তাই কোন জাতিকে শক্তি দ্বারা স্বাধীন করা যেতে পারে যখন শক্তি প্রয়োগে হস্তক্ষেপ বন্ধ করা যায়। কিন্তু স্বাধীনভাবে

www.pathagar.com

বেঁচে থাকা ও স্বাধীনতা প্রিয়তা জোর করে আরোপ করা যায় না। কারো জোর করে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়--সম্ভব নয় শক্তি প্রয়োগে কারো হৃদয়ে বিশ্বাস সৃষ্টি করা। এটাই হচ্ছে "লা-ইকরাহা ফি দ্বীন, ক্বাত্‌তা বাইয়্যানার রুশদু মিনাল গাইয়্যে"—ধর্মে কোন জোর-জুলুম নেই—এ আয়াতাংশের তাৎপর্য। যখন পবিত্র কোরআন বলে যে ধর্মে জোর-জুলুম নেই তার অর্থ এ নয় যে, শক্তি প্রয়োগে ধর্ম গ্রহণ করানো সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও সে শক্তি প্রয়োগ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে এবং লোকদেরকে তাদের ইচ্ছামত যে কোন ধর্ম গ্রহণের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। না, পবিত্র কোরআন যা বলছে তার অর্থ হলো যে জোর করে ধর্ম গ্রহণ করানো যায় না। যা জোর করে চাপানো যায় তা ধর্ম নয়।

যে সমস্ত বেদুইন আরব ইসলামের তাৎপর্য অনুধাবন না করেই এবং হৃদয় মনের প্রগাঢ় অনুভূতি ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ঈমানের দাবী করেছে তাদের উদ্দেশ্যে কোরআন বলছে, "আরবগণ বলে যে আমরা ঈমান এনেছি, তাদেরকে বল "তোমরা ঈমান আনোনি বরং বল আনুগত্য (ইসলাম) স্বীকার করেছ, কেননা ঈমান তোমাদের হৃদয়ে এখনও প্রবেশ করেনি।" (৪৯ ঃ ১৪) এখানে 'আরব' শব্দটি দ্বারা মরুর যাযাবরদেরকে বুঝানো হয়েছে। বেদুইনরা মহানবীর (দঃ) নিকটে এসে ঈমানদার হওয়ার কথা বলত। মহানবীকে আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন তাদেরকে বলার জন্যে তারা সত্যিকার ঈমানদার নয় তাই তাদের বলা উচিত তা শুধু মুসলমান হয়েছে অর্থাৎ তারা নিছক মৌখিক ঘোষণা দিয়েছে। হতে পারে যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ যার মাধ্যমে তারা বাহ্যিকভাবেই মুসলমান হিসেবে বিবেচিত হতে পেরেছে আর ফলে মুসলমান হিসেবে তারা যাবতীয় অধিকার ভোগ করার যোগ্য হয়েছে। মহানবী (দঃ)কে তাদের উদ্দেশে বলতে বলা হয়েছে যে ঈমান তাদের হৃদয়ে এখনও প্রবেশ করেনি। "ঈমান তোমাদের হৃদয়ে এখনও প্রবেশ করেনি—" এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ঈমান হচ্ছে হৃদয়ের ব্যাপার। অন্য একটি বিষয়ও আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে আর তা হচ্ছে যে ইসলাম মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপারে তাকলীদ (অনুকরণ)কে অনুমতি দেয় না বরং এ সব ব্যাপারে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান গবেষণা করতে বলে। নিঃসন্দেহে ধর্মের মৌলিক প্রত্যয়সমূহ আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ থেকে এটা পরিষ্কার

www.pathagar.com

হয়ে গেলো যে ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান হচ্ছে তাকলীদের বন্দীদশার এবং শক্তি ও ক্ষমতার শৃঙ্খল মুক্ত স্বাধীন একটি বিষয়। অতএব ইসলাম যে ধরনের ঈমান চায় তাকে জোর করে সৃষ্টি করা যায় না।

এখন আমরা বুঝতে পারছি যে ইসলামী গবেষকদের দু'ধরনের মতামত মূলতঃ খুবই কাছাকাছি। এক দলের বক্তব্য হচ্ছে তওহীদ হলো মানবতার সার্বজনীন অধিকারের অন্তর্ভুক্ত এবং যেহেতু মানবিক অধিকারের জন্যে যুদ্ধ করা বৈধ তাই তওহীদের খাতিরেও যুদ্ধ করা নিঃসন্দেহে বৈধ। অন্য দলের বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে যে তওহীদের প্রতিরক্ষার জন্য এগিয়ে আসার কোন বিধিসম্মত পথ নেই তাই কোন মুশরিক জাতির বিরুদ্ধে এ জন্যে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে অনুমতি দেয়া হয়নি। এখন উভয় মতের মধ্যে সাযুস্য কোথায় দেখা দরকার। প্রকৃত কথা হচ্ছে যে আমরা যদি ধরেও নেই যে, তওহীদ একটি সার্বজনীন অধিকার তার পরেও তওহীদকে চাপিয়ে দেয়ার জন্যে অন্য জাতির বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করার কোন অধিকার নেই। কেননা আমরা পূর্বেই দেখেছি যে প্রকৃতির দিক থেকেই তওহীদ এমন একটি বিষয় যা জোর করে চাপিয়ে দেয়া যায় না। অন্য একটি দিক? বিবেচ্য যে আমরা যদি তওহীদকে মানবিক অধিকার হিসেবে মেনে নেই এবং মানবতার সর্বোত্তম স্বার্থ ও তওহীদের সর্বোত্তম স্বার্থ কামনা করি তাহলে মুশরিক জাতির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে পারি কিন্তু সে লড়াই তওহীদ ও ঈমানকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্যে নয় কারণ আমরা জানি যে তওহীদ ও ঈমান চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

আমরা অবশ্য মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমাজ থেকে অকল্যাণের মূল শিকড় উপড়ে ফেলার জন্যে লড়াই করতে পারি। কিন্তু কোন সমাজকে অকল্যাণ শের্কমুক্ত করা এক জিনিস আর তওহীদ চাপিয়ে দেয়া অন্য জিনিস।

যারা তওহীদকে ব্যক্তিগত বা বড়জোর জাতীয় অধিকার মনে করেন তাদের মতে তা করা অনুমোদিত নয় পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী চিন্তাধারা যা মুসলমানদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে তা মূলতঃ এ রকমই। তওহীদের মতো বিষয়গুলো ইউরোপীয়দের ব্যক্তিগত বিষয় বলে মনে করে—তা আদৌ জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় এ হচ্ছে কমবেশী একটা প্রথা যা প্রত্যেকটি জাতি পছন্দ মত গ্রহণ করতে পারে। এ ভিত্তিতে তারা মনে করে যে অকল্যাণ ও পাপের শিকড় কাটার জন্যে শের্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার

www.pathagar.com

অধিকার কারো নেই কেননা শের্ক কোন পাপ নয় এবং তওহীদ হচ্ছে নির্ভেজাল ব্যক্তিগত বিষয়।

পক্ষান্তরে যদি আমরা তওহীদকে মানবতার সার্বজনীন অধিকার ও মানবতার সাধারণ সমৃদ্ধি ও কল্যাণের একটি শর্ত হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে তওহীদের দ্বার খুলে দেয়ার জন্যে এবং পাপ ও অবিচারের মূলোৎপাটনের জন্যে যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ বৈধ। যদিও তওহীদ ভিত্তিক বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়া বৈধ নয়।

এখানে ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে। আহবান জানানোর স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করা বৈধ কিনা? আহবান জানানোর স্বাধীনতার অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে আমাদের বিশেষ বিশ্বাসের ও ভাবধারা প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রচারের স্বাধীনতা। বর্তমান যুগের নিছক প্রচারণা চালানোর নয় বরং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রচার ও প্রসার করার স্বাধীনতা এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। স্বাধীনতা সার্বজনীন মানবিক অধিকার হোক বা তওহীদ সার্বজনীন মানবিক অধিকার হোক বা উভয়ই হোক, তার জন্যে প্রচার চালানো নিঃসন্দেহে বিধিসম্মত।

এখন যদি আমাদের আহবানের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয় যেমন কোন শক্তি আমাদের বাধা দিলো এবং আমাদের কথা প্রচারে অনুমতি দিলো না এ অজুহাতে যে আমরা তাদের জাতির চিন্তাধারা ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবো যা অধিকাংশ সরকারই করে থাকে?

সে সরকার যদি আমাদের সত্য দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তখন কি তাদের বিরুদ্ধে তাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত ও বাধা দূর না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করা বৈধ অথবা নয়?

হাঁ, এটাও বৈধ। কারণ এ হচ্ছে প্রতিরক্ষারই প্রয়োজন। তাহচ্ছে এমন এক জিহাদ যার আসল প্রকৃতি হচ্ছে প্রতিরক্ষা।

অধিকার পরিমাপ, ব্যক্তি ও সার্বজনীন

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে জিহাদের প্রাণসত্তা হচ্ছে প্রতিরক্ষা। আরেকটি বিষয় এখন বাকী রয়েছে যে তওহীদ কি সার্বজনীন মানবিক বিষয় না কি কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার অথবা বড়জোর একটি জাতির

www.pathagar.com

অধিকার। এখন ব্যক্তিগত অধিকারের মানদণ্ডের দিকে লক্ষ্য করা দরকার এবং তা কি তা দেখা প্রয়োজন। কোন কোন ব্যাপারে সমস্ত মানুষই একই রকম। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কতকগুলো ব্যাপারে একই রকম আবার অন্য কতকগুলো ব্যাপারে তারা সবাই পৃথক। মানুষের মধ্যে এমন সব পার্থক্য রয়েছে দুইজন মানুষকে সব ব্যাপারে একরূপ পাওয়া যাবে না এবং দু'জন লোকের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে হুবহু মিল দেখতে পাওয়া যায় না ঠিক তেমনি দু'জন লোকের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের ঠিক হুবহু মিল পাওয়া সম্ভব নয়। "স্বার্থটা" সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য তাই এটা তাদের সার্বজনীন অধিকার বটে। স্বাধীনতা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সম্ভাবনার বিকাশের পথে কোন অন্তরায় না থাকা আর এটা সমস্ত মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমার জন্যে স্বাধীনতার যে মূল্য আপনার জন্যও ঠিক একই মূল্য বহন করে। আপনার জন্যে যে মূল্য বহন করে অন্যদের ক্ষেত্রেও তাই। আপনার, আমার মধ্যে অনেক পার্থক্যই রয়েছে এবং তা আমাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারণ সেগুলো নিছক ব্যক্তিগত পার্থক্য মাত্র। একইভাবে আমার এবং অন্য লোকদের মধ্যে বর্ণ ও আকারের দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে আর এ জন্যেই ব্যক্তিত্বের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আমি হয়তো এক ধরনের রংয়ের কাপড় পছন্দ করি আপনি হয়তো অন্য একটি রংয়ের কাপড় পছন্দ করেন। আমি এক ধরনের কাপড় পছন্দ করি আপনি হয়তো আরেক ধরনের কাপড় পছন্দ করেন। আমি এক শহরে বাস করতে পছন্দ করি আপনি হয়তো অন্য শহরে পছন্দ করেন। আমি একটি এলাকা পছন্দ করি আপনি অন্য এলাকা। আমি আমার বাড়ীঘর একভাবে সাজাই আপনি অন্যভাবে। আমি অধ্যয়নের জন্যে একটি বিষয় পছন্দ করি, আপনি হয়তো অন্য একটি বিষয় পছন্দ করেন। এসব কিছুই ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অবশ্যই অন্য কেউ না গলাবে না। এমনি ভাবে বিশেষ কোন একজনকে বিয়ে করার জন্যে কাউকে বাধ্য করা যেতে পারে না, কারণ বিয়ে হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং বিয়ের সঙ্গী যাচাই করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব রুচি ও পছন্দ রয়েছে। ইসলাম বলে যে বিবাহের ক্ষেত্রে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছাইয়ে কাউকে বাধ্য করা যাবে না কারণ এটা তার ব্যক্তিগত অধিকার। ইউরোপীয়রা মনে করেন যে তওহীদ বা ঈমানের ক্ষেত্রে কারো নাক গলানো উচিত নয় কারণ এটা

www.pathagar.com

ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপার, অন্যান্য ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর মতো এটাও একটা বিষয় মাত্র। তারা মনে করেন যে, মানুষ জীবনে অনেক কিছুই উপভোগ করবে এমনি একটি বিষয় হচ্ছে ধর্ম। তাদের মতে এটা একটি শিল্প। এক ব্যক্তি হাফিজকে পছন্দ করেন আরেক জন সাদীকে আবার কেউ মৌলভীকে, কেউ হয়তো খৈয়ামকে পছন্দ করেন, আবার ফেরদৌসীকে।[৬] এক্ষেত্রে যে সাদীকে পছন্দ করেন তাকে কেউ এ কথা বলতে পারেন না যে 'আপনি কেন সাদীকে পছন্দ করেন? আমি তো হাফিজকে পছন্দ করি, তাই আপনাকেও হাফিজকে পছন্দ করতে হবে।" তারা মনে করেন যে ধর্মের ব্যাপারটাও এ রকমই। কেউ পছন্দ করে ইসলাম অন্য কেউ হয়তো খৃষ্টধর্ম, কেউ বা পছন্দ করে জরদস্ত ধর্ম, অন্য কেউ হয়তো ইহুদী ধর্ম পছন্দ করে আবার কেউ হয়তো এর কোনটাই পছন্দ করে না। এ ব্যাপারে কাউকে চাপ দেয়া যাবে না বা কারো কোন অসুবিধা সৃষ্টি করা যাবে না। ইউরোপীয় দৃষ্টিতে ধর্ম কখনও জীবনের প্রধান বিষয় নয়, মানুষের জীবন পদ্ধতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এটাই হচ্ছে মৌলিক ধারণা এবং চিন্তাধারা ও আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। তারা ধর্ম বলতে যা বুঝেন তাদের ধর্মটা এ রকম হতে পারে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' মানবতার জন্যে সরল-সঠিক পথ। কাজেই ধর্মের প্রতি অনীহা মানে সরল পথের, প্রগতি ও মানবতার সঠিক পথের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করা। আমরা বলতে চাই যে, তওহীদ হচ্ছে মানব জাতির কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধির স্তম্ভ, তাই ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত অথবা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা অন্য একটি গোষ্ঠীর ব্যাপার নয়। কাজেই যারা বলেন যে তওহীদ হচ্ছে মানবিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত তাদের কথায়ই প্রকৃত সত্য নিহিত রয়েছে। একই সঙ্গে এ কথাও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, যখন আমরা বলি যে তওহীদকে চাপিয়ে দেয়ার জন্যে যুদ্ধ করা বৈধ নয় তার কারণ এই নয় যে, তওহীদ মানবতার সাধারণ অধিকার নয় বরং এর মূল কারণ হচ্ছে যে তওহীদের প্রকৃতিই এমন যে তাকে চাপিয়ে দেয়া যায় না এবং পবিত্র কোরআনও এ ব্যাপারে জোর দিয়ে বলেছে: লা-ইকরাহা ফি দ্বীন।

চিন্তার স্বাধীনতা না বিশ্বাসের স্বাধীনতা

আর একটি বিষয় এখনও আলোচনার বাকী রয়েছে যে চিন্তার স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মানুষের চিন্তাশক্তি

www.pathagar.com

বলে একটা শক্তি রয়েছে এবং যার বলে মানুষ হিসেবে-নিকেশ করে চিন্তা, যুক্তি-বুদ্ধির ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বাসের বিষয়ের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত ও আবদ্ধ থাকা। আহা! এমন কত বিশ্বাস রয়েছে যার পিছনে সামান্যতম চিন্তার ভিত্তিও নেই এবং এগুলো নিছক অনুকরণ ও অভ্যাস মাত্র যা চিন্তার স্বাধীনতার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন কিছু বিশ্বাসও রয়েছে যার পিছনে সামান্যতম চিন্তা ও ভাবনাও নেই বরং সেগুলো হচ্ছে বংশপরম্পরা চলে আসা নিষ্ক্রিয় ও স্থাবর মনোভাবের ফল, এগুলো হচ্ছে গোলামীর মূল। অতএব এ জাতীয় বিশ্বাস নির্মূল করার জন্যে যুদ্ধ করাকে মানুষের স্বাধীনতার বিপক্ষে নয় বরং মানুষের স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুদ্ধ করা বলা যায়। যে ব্যক্তি নিজের হাতে গড়া মূর্তির সামনে প্রার্থনা জানায় কোরআনের ভাষায় সে ব্যক্তি জীব-জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট অর্থাৎ এ ব্যক্তির কার্যকলাপের পিছনে সামান্যতম যুক্তি-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনাও নেই এবং তার চিন্তার জগতে ঝাকুনি দিলেও সে তা বুঝবে না। সে যা করছে তা নিছক স্থবিরতা ও জড়তা যা তার হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং যা অন্ধত্বের অন্ধ গোলামী মাত্র। এ ব্যক্তিকে এ সমস্ত আভ্যন্তরীণ শিকল যা তাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছে তা থেকে মুক্ত করতে হবে এবং তাকে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দিতে হবে। তাই যারা অন্ধ অনুকরণের স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলিত আত্মা ও চিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতি করেন তারা ভুল করে যাচ্ছেন। যা আমরা সমর্থন করি কোরআনের ঐ আয়াত লা-ইকরাহা ফি দ্বীন—অনুসারে তা হচ্ছে চিন্তার স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

চতুর্থ বক্তৃতাঃ রহিতকরণ প্রশ্ন

রহিতকরণ ঃ

আমাদের আলোচনা চলছে জিহাদ সম্পর্কে। আজ রাতে আমি তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। এর একটির রয়েছে কোরআনের ভিত্তি অপরটির রয়েছে যৌক্তিক ভিত্তি আর তৃতীয়টির কোরআন ও ঐতিহাসিক উভয় ভিত্তি।

কোরআন ভিত্তিক যে দিকটি তা হচ্ছে জিহাদ সংক্রান্ত কোরআনের আয়াত সংশ্লিষ্ট। পূর্বেই আমরা বলেছি যে পবিত্র কোরআনে জিহাদ সম্বন্ধে কতিপয় আয়াত রয়েছে যেগুলো শর্তহীন আর কতিপয় আয়াত শর্তযুক্ত। শর্তহীন আয়াত অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াতে মুনাফিকগণ ও আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শর্তহীন নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোর তাৎপর্য ঐ শর্তযুক্ত ঐ সমস্ত আয়াতের মত যেগুলোতে বিশেষ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদেরকে তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বা যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে যখন তাদের সম্বন্ধে আমাদের আশংকা রয়েছে এবং তারা আমাদের আক্রমণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখন শর্তহীন আয়াত-সমূহকে শর্তযুক্ত আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করা হবে কি না এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলেছি যে আলেমগণের মতামতের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই যে আমাদের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকবে। কেননা বিধান সম্পর্কে সচেতন হলে এবং উভয় ধরনের আয়াতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটা আমরা অনুধাবন করবো যে শর্তযুক্ত আয়াতগুলো মূলতঃ শর্তহীন আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা মাত্র, এ দৃষ্টিতে শর্তযুক্ত আয়াতের ভিত্তিতেই জিহাদের তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে যার অর্থ হচ্ছে যে আমরা জিহাদ সংক্রান্ত কোন আয়াতই শর্তহীন এটা মনে করবো না।

এরপর একটি বিষয় থেকে যায়। কোন কোন কোরআনের ব্যাখ্যাতা এ বিষয়টি রহিত হয়ে গেছে ভেবেছেন। তারা এটা স্বীকার করেন যে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পবিত্র কোরআন কতিপয় শর্ত আরোপ

www.pathagar.com

করেছে কিন্তু তাদের কথা হলো যে অন্যান্য কতিপয় আয়াত নাযিল হওয়ায় ঐ সমস্ত নির্দেশ ও শর্তগুলো রহিত করে দেয়া হয়েছে। এখন আমাদেরকে রহিতকরণ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা দরকার। রহিতকরণ কি, কিসে রহিত হয় এবং কি রহিত হয়? কেউ কেউ মনে করেন যে, যেহেতু সূরা তওবার প্রথম আয়াতে যুদ্ধের পরিপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে মক্কায় থাকার অবকাশ দেয়া হয়েছে কিন্তু ঐ সময় পার হয়ে গেলে তাদের মক্কায় থাকার কোন অধিকার থাকবে না, মুসলমানগণ তাদেরকে গোপনস্থল থেকেও পাকড়াও করে হত্যা করবে এবং অধিকন্তু এ সূরাটি নবম হিজরীতে নাযিল হয়েছে তাই তাদের মতে জিহাদ সংক্রান্ত পূর্ব প্রদত্ত সমস্ত নির্দেশ ও শর্তসমূহ বাতিল বা রহিত হয়ে গেছে। এ মতামত কি সঠিক?

না, এ মত সঠিক নয়। কেন? দুটো কারণে। একটি কারণ হচ্ছে এই যে একটি আয়াতকে আরেকটি আয়াতের রহিতকারী তখনই আমরা মনে করতে পারি যখন তারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হবে। মনে করুন একটি আয়াতে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হ'লো আবার পরবর্তী সময়ে অন্য আয়াতে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অনুমতি দেয়া হলো। এ ক্ষেত্রেই বলা যাবে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রথমোক্ত নির্দেশ বাতিল করেছেন। এটাকেই বলা হয় রহিতকরণ। প্রথম নির্দেশটি রহিত করা হলো এবং অন্য একটি নির্দেশ তার স্থলে দেয়া হলো। তাই দ্বিতীয় নির্দেশটি অবশ্যই এমন হতে হবে, যা প্রথমটির একশোভাগ বিপরীত। কিন্তু যদি প্রথম আয়াত ও দ্বিতীয় আয়াতের বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় এবং একটি আরেকটির অর্থ পরিষ্কার করে তাহলে রহিত হওয়া বা রহিত করার প্রশ্নই উঠে না।

সূরা তওবার আয়াতগুলো এমন নয় যে পূর্বে প্রদত্ত শর্তযুক্ত জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতগুলো রহিত করে দিচ্ছে। কেন নয়? কারণ, যদি সূরা তওবার সমস্ত আয়াতগুলোকে আমরা বিচার করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে সমষ্টিগতভাবে এ আয়াতগুলোর বক্তব্য হচ্ছে যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এ জন্যে লড়াই করতে যে তারা মানবতার একটি অপরিহার্য বিধান—যা প্রতিশ্রুতি রক্ষা—তারা পালন করছে না। প্রতিশ্রুতি পালন এমন একটি বিষয় যা প্রত্যেকটি মানুষ জরুরী মনে করে এমনকি

www.pathagar.com

কোন দেশের আইনে তার গুরুত্ব থাকুক বা না থাকুক তা সত্ত্বেও এর গুরুত্ব সবাই স্বীকার করে। তাই এসব কিছুই আমাদেরকে এটাই বলছে যে যদি আমরা তাদের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ থাকি এবং যে কোন সুযোগে যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে এবং আমাদের ধ্বংস ও উৎখাত করার প্রচেষ্টা চালায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তি কি বলে? যদি আমরা এমন কোন প্রমাণ পাই যে কেউ প্রথম সুযোগেই আমাদেরকে ধ্বংস করতে উদ্যত তাহলে যুক্তি-বুদ্ধি কি এটা বলে যে তারা প্রথম আঘাত হানা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে? তাদেরকে প্রথম আক্রমণ করা যাবে না? যদি আমরা তাদের প্রথম আক্রমণের অপেক্ষায় বসে থাকি তাহলে তারা আমাদের ধ্বংস করে ছাড়বে। বর্তমান যুগে দেখা যায় যে কোন জাতি হয়তো এ কারণে অপর জাতির ওপর আক্রমণ করে বসে যে, সে পক্ষ তাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এ ধরনের আক্রমণকে দুনিয়ার লোকেরা বলবে যে এটা বৈধ এবং যথার্থ হয়েছে। কেউ এটা বলবে না যে শত্রুপক্ষ, উদাহরণস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট দিনে আক্রমণ করতে যাচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ পাওয়ার পরও শত্রুর ওপর আজ আক্রমণ করা যাবে না। তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা রেখে বসে থাকতে হবে এবং যখন আক্রান্ত হবে তখনই যুদ্ধ শুরু করা যাবে।

পবিত্র কোরআনের কঠোরতম সূরা বারাআয়াতের ঐ সমস্ত আয়াত আমাদেরকে বলছে "কি! তারা তোমাদের কাবু করতে পারলে না তারা নিকটাত্মীয়তার কথা খেয়াল রাখে, না প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্বের কথা মনে করে। তারা মুখের দ্বারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে।" (৯ঃ৮) আয়াতটি এ কথা বলছে যে যখনই তারা সুযোগ পায় তখনই কোন সন্ধি চুক্তি ওয়াদা প্রতিশ্রুতির পরোয়া করে না এবং যা তারা বলে তা শুধু মুখে মুখে বলে, অন্তর তাদের শত্রুতায় পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে যে শত্রুর দিক থেকে বিপদের প্রবল আশংকা সৃষ্টি হলে আমাদের অস্ত্র সংবরণ করে বসে থাকলে ভুল হবে। অতএব এ সমস্ত আয়াতকে অন্য আয়াতগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের রহিতকারী মনে করা যাবে না। এটাই হচ্ছে প্রথম কারণ কেন সে আয়াতগুলো রহিতকারী আয়াত নয়।

www.pathagar.com

ব্যতিক্রম ছাড়া কোন সাধারণ নিয়ম নেই

দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে যা উসুলে ফিকাহ্‌র আলেমগণ বলে থাকেন এবং যদি আমি আপনার সামনে তা ব্যাখ্যা করি তাহলে দ্বিতীয় কারণটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আলেমগণের মতে ঃ এমন কোন সাধারণ নিয়ম নেই যার কোন ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না। এ কথাটি পুরোপুরি সত্য। আমাদের রমযানে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু যদি আমরা সফরে থাকি কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। নামাজের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ব্যতিক্রমের সুযোগ রয়েছে। নামাজ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে একই ধরনের ব্যতিক্রম করার সুযোগ আছে। এমন কোন সাধারণ বিধি নেই যার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম থাকবে না। এমন কি এই সাধারণ নিয়মেরও ব্যতিক্রম রয়েছে। এমন কিছু সাধারণ নিয়ম রয়েছে যাদের সত্যি কোন ব্যতিক্রম নেই। অর্থাৎ কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা কখনও রহিতযোগ্য নয় বা ব্যতিক্রমের কোন সুযোগ এগুলোতে নেই। এগুলোর ধারণটাই এমন যে ব্যতিক্রম সেখানে সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।" (৩৯ ঃ ৭) এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। এটা কখনও সম্ভব নয় যে কখনও এমন অবস্থা হবে যখন একজন মানুষ আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সত্ত্বেও আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন না। না, এমন নয়। তা এমন বিষয় নয় যে কোন পরিস্থিতিতে তার মধ্যে ব্যতিক্রম হবে যতক্ষণ না সে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হবে। অনুরূপভাবে রহিতকরণ সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। এমন কতকগুলো আয়াত রয়েছে যা মৌখিকভাবে রহিত বা বাতিলযোগ্য নয়। কারণ রহিতকরণের অর্থই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জিনিসটি অস্থায়ী ধরনের ছিল। এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা অস্থায়ী প্রকৃতির হতেই পারে না। সেই বিষয়ে নির্দেশ দিলে স্থায়ীভাবে নির্দেশ দিতে হবে। এখানে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতে আমাদের বলা হয়েছে ঃ "সীমা লংঘন করো না, কারণ আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" (২ ঃ ১৯০) এটি হচ্ছে একটি সাধারণ নির্দেশ যা স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে প্রযোজ্য। এর কি কোন ব্যতিক্রম সম্ভব? আমরা কি বলতে পারি যে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া

www.pathagar.com

আল্লাহ্ জালেমদের পছন্দ করেন না? ঐশী পবিত্রতা একদিকে, আবার জুলুম-অত্যাচারের অপবিত্রতা ও নোংরামী আর একদিকে এক সাথে চলতে পারে না—যে আমরা বলবো আল্লাহ্ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না তবে অমুক অমুক এর ব্যতিক্রম। এটা এমন এক সাধারণ বিধি যার কোন ব্যতিক্রম নেই। এটা রোযার মত নয় যে আমরা বলবো এই অবস্থায় না থাকলে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। রোযার ক্ষেত্রে তা সম্ভব যে বিশেষ ক্ষেত্রে রোযা না রাখলেও চলে। কিন্তু জুলুম এমন একটি বিষয় নয় যে এক অবস্থায় আমরা জালেম হতে পারি আর এক অবস্থায় হতে পারি না। যেখানেই জুলুম-অত্যাচার যেই করুক না কেন তা অন্যায় এবং অপরাধ এমন কি নবীও যদি এমন করেন তাহলেও তা হবে তিরস্কার-যোগ্য পাপ ও অবাধ্যতা। যারা অবাধ্য আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন না। "নবী-রসূলগণের অন্যায় ছাড়া" এ কথা আমরা বলতে পারি না। এটাও গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কি নবীগণও (দঃ) যদি (আল্লাহ্ আমাকে এ ধরনের ধারণা হতে মুক্ত রাখুন)—কোন অপরাধ করেন তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসবেন না। নবী (সঃ) ও যারা নবী নন তাদের মধ্যে পার্থক্য এ নয় যে নবী অপরাধ করেন তা সত্ত্বেও তাদেরকে আল্লাহ্ ভালো-বাসেন বরং নবী কখনও অপরাধ করেন না অন্যরা তা করেন। কাজেই এ হচ্ছে এমন সাধারণ নিয়ম যার কোন ব্যতিক্রম নেই। সময়ের পরিবর্তনেও এ নীতির কোন পরিবর্তন নেই। এটা কি বলা যাবে যে এ নীতি বিশেষ সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন এক সময়ে আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের ভালোবাসেন না—কিন্তু দশ বছর পর আল্লাহ্ নীতি পরিবর্তন করলেন এবং নির্দেশটি পরিবর্তন করে জানিয়ে দিলেন যে এখন থেকে তিনি সীমা লংঘনকারীদের ভালোবাসবেন। না, এধরনের রহিতকরণ সম্ভব নয়।

জিহাদ সংক্রান্ত প্রথম আয়াতটি এ ধরনেরই। "আল্লাহ্র পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে এবং সীমা লংঘন করো না, যারা সীমা লংঘন করে আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন না, (২ ঃ ১৯০) যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যারা আমাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের আগ্রাসন চালায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু নিজেরা আগ্রাসনকারী হওয়া যাবে না। আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আগ্রাসন নয়। কিন্তু আগ্রাসন ছাড়া কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ আগ্রাসন এবং অবৈধ।

www.pathagar.com

আমাদেরকে আগ্রাসনকে দূরীভূত করার জন্যে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত কিন্তু আগ্রাসন শক্তি ছাড়া অন্য কারোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে আমরা নিজেরাই আগ্রাসী শক্তি বলে বিবেচিত হবো। এ ক্ষেত্রে 'রহিতকরণ' নীতি প্রযোজ্য নয়। এটা সম্ভব যে উদারণস্বরূপ আমাদের সর্বোত্তম স্বার্থেই জিহাদ ও আত্মরক্ষার অনুমতি কিছু সময়ের জন্যে স্থগিত রেখে ধৈর্যের নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হলো এবং পরবর্তী পর্যায়ে ধৈর্যের নীতি বাতিল করে জিহাদের নির্দেশ আসলো। কারণ ধৈর্য ধারণের এ বিশেষ নীতিটি ছিল সাময়িক ধরনের। যে বিধানটি রহিত করা হয়েছে তার ধারণাটাই ছিলো এমন যে শুরু থেকে এটা ছিলো সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।

মানবিক অধিকার রক্ষা

তদনুসারে পবিত্র কোরআন কড়াকড়িভাবে জিহাদকে প্রতিরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং শুধু আগ্রাসনের মুকাবেলায় তার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু আমাদের গত বক্তৃতায় আমরা বলেছি যে মানবিক মূল্যবোধ এমন কি তা বিপন্ন না হলেও সম্প্রসারণের জন্যে যে যুদ্ধ তাকে নিন্দা করা যায় না। আমরা আরো বলেছি যে আগ্রাসন বলতে সাধারণ অর্থই গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ শুধু জীবন, সম্পত্তি, উপকরণ, ভূমি ইত্যাদির বিরুদ্ধে হলেই আগ্রাসন হবে এমন নয়, এমন কি স্বাধীনতা ও মুক্তির বিরুদ্ধে যা তাই শুধু আগ্রাসন নয় বরং মানবিক মূল্যবোধ বলে বিবেচিত যে কোন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যদি কোন গোষ্ঠী আক্রমণ চালায় তা হলে তাও হবে আগ্রাসন।

আমি এখানে একটি উদাহরণ দিতে চাই। বর্তমান যুগে বিভিন্ন রোগের মূলোৎপাটন করার জন্যে বিপুল প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোন কোন রোগের যেমন ক্যান্সারের প্রাথমিক কারণও আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। কাজেই তাদের সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতিও অজানা রয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু কিছু ওষুধ মানুষ ব্যবহার করে থাকে যাতে করে সে সমস্ত রোগের প্রতিক্রিয়াকে বিলম্বিত করা যায়। মনে করুন কোন প্রতিষ্ঠান এ জাতীয় ব্যাধির কোন একটির প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো। কিন্তু সে সব প্রতিষ্ঠান ঐ রোগের অস্তিত্বের কারণে লাভবান হচ্ছে না, যে সমস্ত কারখানা সে রোগের ব্যবহারপোযোগী ওষুধ তৈরী করছিলো তারা

www.pathagar.com

তাদের বাজার যাতে নষ্ট না হয়—এ ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলারের লোকসানের আশংকা রয়েছে—তার জন্যে তারা নব আবিষ্কৃত প্রতিষেধক যা মানবতার জন্যে প্রচুর কল্যাণকর তাকে ধ্বংস করতে চায় যারা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদেরকে এবং আবিষ্কৃত ফর্মুলাকে তারা ধ্বংস করতে চায় যাতে এ সম্পর্কে আর কেউ অবগত হতে না পারে। এখন এ মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করা হবে, না হবে না? আমরা কি এ কথা বলতে পারি যে যেহেতু কেউ আমাদের জানমাল, উপায়-উপকরণের ওপর আক্রমণ চালায়নি। কেউ আমাদের স্বাধীনতা বা দেশ কেড়ে নিতে চায়নি, শুধুমাত্র পৃথিবীর এক কোণে এক ব্যক্তি একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছে এবং অন্য কোণে আরেক ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিটিকে —তার আবিষ্কারকে মুছে ফেলতে চায় এতে আমাদের কি বা আসে যায়? না, এখানে আমাদের কি আসে যায় এ কথা বলার সুযোগ নেই। এখানে মানবিক মূল্যবোধ মর্যাদা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মানবিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি আমরা প্রতিরোধ প্রতিরক্ষার ও যুদ্ধের ভূমিকা গ্রহণ করি, তাহলে কি আমরা আক্রমণকারী বলে বিবেচিত হবো? না, কারণ এ ক্ষেত্রে আমরা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি এবং আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি।

যখন আমরা বলি যে জিহাদের মূল কথা হচ্ছে প্রতিরক্ষা, তখন প্রতিরক্ষা বলতে সীমিত অর্থে শুধু ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার্থে—যখন সে তলোয়ার, বন্দুক অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত হয়—বুঝায় না। এর মাধ্যমে বরং আমরা এটাই বুঝাতে চাই যে যখন কোন ব্যক্তির সত্তা, তার বৈষয়িক উপকরণ বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ অথবা মানব জাতির জন্যে যাকে মূল্যবান বা সম্মানর্হ এবং যা মানবতার সুখ-সমৃদ্ধির শর্ত বলে বিবেচিত সে সব যদি আক্রান্ত হয় তখন অবশ্যই তাকে প্রতিরোধ করতে হবে।

এখানে আবার সে প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয় যে তওহীদ কি ব্যক্তিগত ব্যাপার না কি অন্যতম মানবিক ব্যাপার? যদি তাকে অন্যতম মানবিক বিষয় বলা হয় তাহলে অবশ্যই তার প্রতিরক্ষায় এগিয়ে যেতে হবে। যদি অন্যতম মানবিক ব্যাপার হিসেবে তওহীদকে রক্ষা আবশ্যক হয় তথাপিও কোন ধরনের আগ্রাসন বৈধ নয়। এর অর্থ হচ্ছে তওহীদ হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিষয়

www.pathagar.com

এবং প্রতিরক্ষা এমন এক ব্যাপক বিষয় যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারটিও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কিন্তু তদসত্ত্বেও আবার আমি এ কথারই পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে তওহীদকে চাপিয়ে দেয়ার জন্যে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করবো না। কেননা তওহীদ হচ্ছে একটি বিশ্বাস, একটি প্রত্যয়। আর বিশ্বাস গড়ে ওঠে—বিচার বুদ্ধি ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে আর বিচার-বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি শক্তি দ্বারা প্রভাবিত করা যায় না। পছন্দের ও বাছাই-এর ক্ষেত্রেও একই কথা। 'লা-ইকরাহা ফি দ্বীন' এর অর্থ হচ্ছে ঈমান গ্রহণে আমরা কাউকে বাধ্য করতে পারি না কারণ ঈমান বাধ্য করার মতো কোন বিষয় নয়। কিন্তু "লা-ইকরাহা ফি দ্বীন" এর অর্থ এই নয় যে আমরা তওহীদের অধিকারকে রক্ষার ব্যবস্থা করবো না। এর অর্থ এও নয় যে যখন কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কোন দিক থেকে বিপদের সম্মুখীন হয় আমরা তা প্রতিরোধ করবো না। না, আদৌ তা নয়।

বিশ্বাসের স্বাধীনতা অথবা চিন্তার স্বাধীনতা?

ধর্মকে কারো ওপর চাপানো যাবে না। এবং ধর্ম গ্রহণে সবারই স্বাধীন সুযোগ থাকবে এটা একটি বিষয়। কিন্তু বিশ্বাসকে—বর্তমানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়—তা মুক্ত স্বাধীনতা দিতে হবে, এটা ভিন্ন একটি বিষয়। অন্য কথায় চিন্তা ও বাছাইয়ের স্বাধীনতা এক জিনিস আর বিশ্বাসের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ আরেক জিনিস। অনেক বিশ্বাসের পিছনে রয়েছে চিন্তা-ভাবনা অর্থাৎ সেগুলো বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে এবং তাই স্বাধীন-ভাবে গৃহীত হয়েছে। কোন ব্যক্তির হৃদয়ে কোন বিশ্বাসের প্রতি আকর্ষণ ও নিষ্ঠার পিছনে অনেক ক্ষেত্রেই চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বুদ্ধি ও যাচাই-বাছাই সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু সমস্ত মানবিক বিশ্বাসই চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বুদ্ধি এবং যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে? অথবা এটা কি সত্য নয় যে, অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাসই চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল নয় বরং নিছক ভাবাবেগ তাড়িত ব্যাপার মাত্র? পবিত্র কোরআন বংশানুক্রমিক অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণের প্রবণতার উদাহরণ দিয়েছে: "নিশ্চয় আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এ মতের ওপর পেয়েছি এবং আমরা তাদের পথই অনুসরণ করেছি।" (৪৩ : ২৩) পবিত্র কোরআন এ বিষয়ের ওপর যথেষ্ট

www.pathagar.com

জোর দিয়েছে। এবং সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকদের অনুকরণের ভিত্তিতে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে তার সম্পর্কেও একই কথা। এ সব ক্ষেত্রে "বিশ্বাসের স্বাধীনতা" কথাটি অর্থহীন। কেননা, স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে সক্রিয় ও সম্মুখগামী শক্তিসমূহের পথে বাধার অনুপস্থিতি কিন্তু এ জাতীয় বিশ্বাস তো এক ধরনের সংকীর্ণতা ও স্থবিরতা ছাড়া আর কিছু নয়। আবদ্ধ অবস্থায় স্বাধীনতা জীবনব্যাপী বন্দী মানুষের স্বাধীনতা বা ভারী শিকলে শৃঙ্খলিত ব্যক্তির স্বাধীনতার সমান। শুধু পার্থক্য হচ্ছে যে ব্যক্তি দৈহিকভাবে শৃঙ্খলিত সে তার অবস্থা অনুভব করতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তির আত্মা শৃঙ্খলিত সে তার অবস্থাও অনুভব করতে পারে না। বস্তুতঃ অন্ধ অনুকরণ ও পরিবেশের প্রভাবজনিত বিশ্বাসের স্বাধীনতা একটি অর্থহীন স্বাধীনতা এ কথা বলতে আমরা এ ব্যাপারটাই বুঝাতে চেয়েছি।

জিজিয়া

আমাদের আলোচনার সর্বশেষ বিষয় হচ্ছে জিজিয়া সংক্রান্ত। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে আহলে কিতাবদের সঙ্গে জিজিয়া দিতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে। এ জিজিয়া কি? এটা কি কোন প্রতিরক্ষামূলক অর্থ? অতীতের মুসলমানগণ যে জিজিয়া গ্রহণ করতেন তা কি প্রতিরক্ষার বিনিময় ছিলো? প্রতিরক্ষার জন্যে দেয় অর্থ যেরূপই হোক না কেন তা অন্যায় ও জুলুম এবং পবিত্র কোরআন তাকে বাতিল ঘোষণা করেছে। জিজিয়া শব্দটি আরবী ধাতু জোজা থেকে উদ্ভূত। আরবী ভাষায় 'জোজা' শব্দটি পুরস্কার এবং শাস্তি 'উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যদি জিজিয়াকে শাস্তি অর্থে ধরা হয় তাহলে জিজিয়াকে 'প্রতিরক্ষামূলক অর্থ' হিসেবেই মনে করা যেতে পারে কিন্তু যদি একে পুরস্কার অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে বিষয়টির ভিন্ন রূপ অর্থ দাঁড়ায়।

পূর্বেই আমরা বলেছি যে কেউ কেউ দাবী করেছেন যে জিজিয়া শব্দটি মূল বিচারে একটি অনারবী ফার্সী শব্দ এবং তা ফার্সী 'গাজিয়া' শব্দের আরবীকৃত রূপ মাত্র। 'গাজিয়া' এক ধরনের কর যা পারস্য বাদশা অনু-শিরওয়া প্রবর্তন করেছিলেন। যখন সে শব্দটি আরবী ভাষায় প্রবেশ করলো তখন স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী 'গাফ' বর্ণটি 'জিম' বর্ণে রূপান্তরিত হলো ফলে আরবরা 'গাজিয়া' বলার পরিবর্তে 'জেজিয়া' বলতে শুরু করলো। এ

www.pathagar.com

দৃষ্টিতে জেজিয়া হচ্ছে একটি কর বিশেষ যা ও প্রতিরক্ষামূলক অর্থ এক জিনিস নয়। মুসলমানদেরকেও কর দিতে হয়। মুসলমানদের দেয় কর ও আহলে কিতাবদের দেয় করের মধ্যে পার্থক্য বাস্তবে ধরনের ক্ষেত্রে মাত্র। অবশ্য জিজিয়া শব্দটি ধাতুগত বিচারে আরবী নয় এ ধরনের অভিমতের পিছনে কোন প্রমাণ নিহিত নেই। যাই হোক শব্দের ধাতু বিচার আমাদের কোন অভীষ্ট নয়। এর মূল যাই হোক জিজিয়াকে ইসলামী আইন যেভাবে প্রবর্তন করেছে এবং বাস্তব রূপ দিয়েছে তাই আমাদেরকে বিচার করে দেখতে হবে।

আমাদের দেখা দরকার যে ইসলাম কি জিজিয়াকে পুরস্কার বিবেচনা করে না কি শাস্তি? যদি জিজিয়ার বিনিময়ে ইসলাম কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে, নির্দিষ্ট সেবা প্রদান করে তাহলে জিজিয়া হচ্ছে তার পুরস্কার। আর যদি কোন বিনিময় প্রদান ছাড়াই জিজিয়া গ্রহণ করা হয় তা হলে তা হবে প্রতিরক্ষামূলক অর্থ।" যদি ইসলাম কখনও এ কথা বলতো যে কোন বিনিময় প্রদান ছাড়াই আহলে কিতাবদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তাহলে অবশ্য জিজিয়া এক ধরনের "প্রতিরক্ষামূলক অর্থ" একথা বলা যেত। 'প্রতিরক্ষামূলক অর্থ' গ্রহণ মানেই হচ্ছে শক্তি প্রয়োগের অধিকার লাভ করা। এর অর্থ হচ্ছে যে, শক্তিশালী যারা তারা দুর্বলদের নিকট তাদের জানমালের নিরাপত্তার জন্যে, ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্যে তাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে। কিন্তু যদি ইসলাম আহলে কিতাবদের নিকট বিনিময় প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে জিজিয়া দাবী করে তাহলে জিজিয়া শব্দটি আরবী হোক আর ফার্সী হোক উভয় অবস্থায়ই এর অর্থ পুরস্কার। আমাদের শব্দের প্রকৃতি নয় আইনের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করতে হবে।

জিজিয়া সংক্রান্ত আইনের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে আমরা দেখবো জিজিয়া ঐ সমস্ত আহলে কিতাবদের জন্যে দেয় যারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অধীনেও তার প্রজা হিসেবে বাস করে। একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে তার জাতির প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে: অনুরূপভাবে জাতির লোকদের রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। এর অন্যতম হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বাজেট পূরণের জন্যে কর প্রদান। এ সমস্ত করের মধ্যে রয়েছে জাকাত এবং জাকাত ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত কর যা রাষ্ট্র গঠনের সর্বোত্তম স্বার্থে

www.pathagar.com

যে সমস্ত কর আরোপ করে থাকে। এ সমস্ত কর অবশ্যই জনগণকে আদায় করতে হবে। অন্যথায় রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবে অচল হয়ে পড়বে। এমন কোন সরকার নেই যার কোন বাজেট থাকে না। বাজেটে যার আংশিক কর সম্পূর্ণটা জনগণের নিকট থেকে কোন না কোনভাবে আদায় করা হয় না। যে কোন সরকারই বাজেটের অর্থ সংস্থানের জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করের ওপর নির্ভর করতে হয়।

নাগরিক কর্তব্যসমূহের দ্বিতীয়টি হচ্ছে দেশের স্বার্থে সৈন্য সরবরাহ ও ত্যাগ তিতিক্ষাকে বরণ করে নেয়া। দেশের ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসাটা অসম্ভব নয় এবং এমনি পরিস্থিতিতে দেশের নাগরিকদেরকেই এর প্রতিরক্ষার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। যদি আহলে কিতাবগণ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করে তাহলেও তারা ঐ সমস্ত ইসলামী কর প্রদান করতে ও জিহাদে অংশ নিতে বাধ্য নয় যদিও জিহাদের ফলে কোন সুযোগ-সুবিধা অর্জিত হলে তারাও এ থেকে উপকার পেতে পারে। কাজেই যখন কোন ইসলামী সরকার কোন জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার বিধান করে এবং তাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে তখন সরকার ঐ জনগোষ্ঠী তার নিজ জাতির হোক আর অন্য জাতির হোক তাদের নিকট আর্থিক ও অন্যান্য বিনিময় দাবী করতে পারে। আহলে কিতাবদের নিকট জাকাত ও অন্যান্য করের পরিবর্তে জিজিয়া দাবী করা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যদি আহলে কিতাবগণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলমানদের স্বার্থে মুসলমানদের মতোই যুদ্ধে অংশ নিতো তাহলে তাদের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থ তাদেরকে আবার এ বলে ফেরত দেয়া হতো যে জিজিয়া এই জন্যেই তাদের নিকট থেকে নেয়া হয়েছিলো যে তারা যুদ্ধে অংশ নিতে রাজী নয় কিন্তু এখন যেহেতু তারা সৈন্য সরবরাহ করেছে তাই তাদের অর্থ গ্রহণের আর ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অধিকার নেই। পবিত্র কোরআনের আল মানার শাওয়াহীদ নামক তফসির গ্রন্থে বিভিন্ন ইতিহাস থেকে এমন অনেক ঘটনাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিভাবে প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ সৈনিকের পরিবর্তে জিজিয়া গ্রহণ করতো এবং আহলে কিতাবগণ বলতো যেহেতু তারা ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলমানদের নিরাপত্তার অধীনে বাস করছে এবং যেহেতু তারা যুদ্ধে সৈন্য সরবরাহ করছে না (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানগণ তাদের সৈন্য

www.pathagar.com

গ্রহণও করতে চাইতো না) তাই সৈন্য সরবরাহের পরিবর্তে তাদের জিজিয়া দেয়া উচিত। কিন্তু যদি কখনও তাদের প্রতি আস্থা সৃষ্টি হতো এবং তাদের থেকে সৈন্য গ্রহণ করতো তখন আর ঐ সব লোকদের নিকট থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হতো না। জিজিয়া শব্দটি আরবী হোক আর ফার্সী হোক জোজা বা গাজিয়া যে কোনটি থেকে উদ্ভূত হোক এখন এটা খুবই পরিষ্কার যে আইনগত দিক থেকে জিজিয়া হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তার অমুসলমান নাগরিকদের পক্ষ থেকে পুরস্কার বিশেষ। আর এ পুরস্কার হচ্ছে তাদের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে রাষ্ট্রকে সৈন্য সরবরাহ না করা এবং অন্য কোন কর না দেয়ার বিনিময়।

এখন জিজিয়ার বিনিময়ে জিহাদ কেন এবং কিভাবে বন্ধ করেছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইসলাম কেন জিহাদ চায় "এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়ার জন্যে ইসলামের জিহাদ নয়। তার জিহাদ হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যে, যখনই প্রতিপক্ষ বলবে যে আমাদের সঙ্গে তাদের কোন যুদ্ধ নেই এবং তারা তওহীদ প্রচারে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না তখন কোরআনের বিধান "এবং যদি তারা শান্তি চায় তোমরাও চাইবে --(৮ ঃ ৬১) অনুসারে কাজ করতে হবে। যদি তারা বিনীত হয় এবং শান্তি ও আপোসের মানসিকতা ও মনোভাব প্রকাশ করে তাহলে তাদের প্রতি আমাদেরকেও আরো কঠোর হওয়া চলবে না। আমাদের এ কথা বলা চলবে না "ওহে, আমরা শান্তি চাইনে, আমরা যুদ্ধ করতেই প্রস্তুত।" এখন যেহেতু তারা শান্তির জন্যে হাত বাড়িয়েছে আমাদেরকেও তাই করতে হবে। অবশ্য তারা যেহেতু আমাদের নিরাপত্তার অধীনে বাস করতে চায় এবং আমরা তাদের নিকট থেকে কোন ইসলামী করও আদায় করছি না, তাদের কাছ থেকে সৈন্যও দাবী করছি না এবং তাদের ওপর এ ব্যাপারে আমাদের আস্থাও নেই তাই তাদের জন্য আমাদের সেবাকর্ম ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্যে আমরা এক সরল সাধারণ কর আদায় করে থাকি যার নাম জিজিয়া।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ঃ

কতিপয় খৃষ্টান ঐতিহাসিক যেমন, গোষ্টাভ লি বন এবং জর্জ জায়দুন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উইল ডুরান্ট ও তার The story of civilization নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে জিজিয়া সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, ইসলামী জিজিয়ার পরিমাণ এত কম ছিলো যে মুসলমানগণ যে পরিমাণ কর প্রদান করত তার চেয়েও কম ছিলো। কখনও অতিরিক্ত আদায়ের প্রশ্নই উঠতো না। অধিকন্তু আহলে কিতাবদেরকে জিজিয়া দিতে হতো বিধায় তাদের উপর ধর্ম-বিশ্বাস জোর করে চাপিয়ে দেয়ারও সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গিয়েছিলো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শহীদ আয়াতুল্লাহ মোতাহারীর জন্ম ইরানের খোরাসান প্রদেশে, ১৯২০ সালে। ইমাম খোমেনীর প্রিয়তম ছাত্রদের তিনি পুরোধা। সমসাময়িক ইরানের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ও ফকীহদের ও তিনি অন্যতম। বিদা'ত আর বিকৃতির বিরুদ্ধে তিনি কঠোরভাবে সংগ্রাম করেছেন। ইরানের পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবসমাজকে [illegible]ল ইসলামী দর্শন ও মুত্তাকী আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে [illegible]ক্ষেত্রে আয়াতুল্লাহ মোতাহারীর অবদান অসাধারন। তিনি মার্কসীয় [illegible]র বিষাক্ত সংক্রমন থেকে ইসলামকে হেফাজত করতে শিখিয়েছেন। [illegible]ারআন ও ইসলামের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে প্রতিহত করেছেন। [illegible]ষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষিতরাও মাদ্রাসার নির্ভেজাল ধর্মীয় শিক্ষার [illegible]ল এবং অনেকেই মাদ্রাসায় পড়াশোনার জন্য ভর্তি ও হন॥

[illegible]ামী বিপ্লবের বিজয়ের পর পরই ১লা মে, ১৯৭৯ তারিখে [illegible] 'ফুরকান' গ্রুপের গুলীতে তিনি শহীদ হন॥